যত কাণ্ড কাঠমাণ্ডুতে

সত্যজিৎ রায়

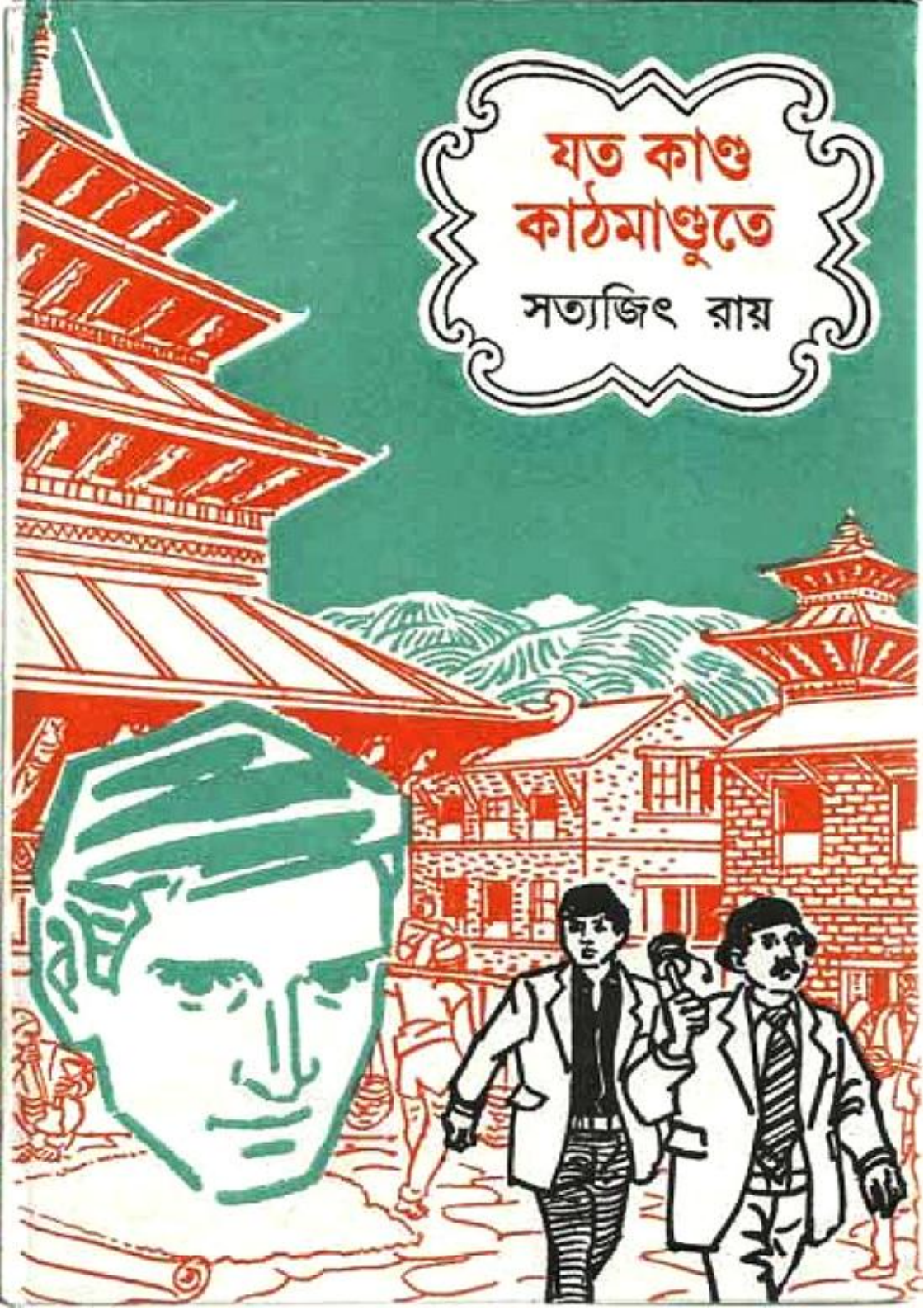

ফেলুদা

যত কাণ্ড কাঠমাণ্ডুতে

সত্যজিৎ রায়

১

রহস্য-রোমাঞ্চ ঔপন্যাসিক লালমোহন গাঙ্গুলী ওরফে জটায়ুর মতে, হগ সাহেবের বাজারের মতো বাজার নাকি ভূ-ভারতে নেই। যারা জানে না তাদের জন্যে বলা দরকার যে হগ সাহেবের বাজার হল আমরা যাকে নিউ মার্কেট বলি তারই আদি নাম। —দিল্লি বোম্বাই যোধপুর জয়পুর সিমলা কাশী, সবই তো দেখলুম, আর আপনাদের সঙ্গেই দেখলুম, কিন্তু আন্ডার দি সোম রুফ এমন একটা বাজার কোথাও দেখেছেন কি?

এ ব্যাপারে অবিশ্যি আমি আর ফেলুদা দুজনেই লালমোহনবাবুর সঙ্গে একমত। মাঝে একটা কথা হয়েছিল যে এই মার্কেট ভেঙে ফেলে সেখানে একটা মাল্টি-স্টোরি সুপার মার্কেট তৈরি হবে। ফেলুদা তো শুনেই ফায়ার। বলল, এ কাজটা হলে কলকাতার অর্ধেক কলকাতাত্বি চলে যাবে সেটা কি এরা বুঝতে পারছে না? নগরবাসীদের কর্তব্য প্রয়োজনে অনশন করে এই ধ্বংসের পথ বন্ধ করা।

আমরা তিনজন গ্লোবে ম্যাটিনিতে এপ অ্যান্ড সুপার এপ দেখে বাইরে এসে নিউ মার্কেটে যাব বলে স্থির করেছি। লালমোহনবাবুর টর্চের ব্যাটারি। আর ডট পেনের রিফিল কেনা দরকার, আর ফেলুদাও বলল কলিমুদ্দির দোকান থেকে ডালমুট নিয়ে নেবে; বাড়ির ডালমুট মিইয়ে গেছে, অথচ চায়ের সঙ্গে ওটা চাই-ই চাই। তা ছাড়া লালমোহনবাবুর একবার মার্কেটটা ঘুরে দেখা দরকার, কারণ কালই নাকি এই মার্কেটকে সেন্টার করে একটা ভাল ভূতুড়ে গল্পের প্লট ওঁর মাথায় এসেছে। ট্রাফিক বাঁচিয়ে রাস্তা পেরিয়ে প্রাইভেট গাড়ি ও ট্যাক্সির লাইনের ফাঁক দিয়ে এগোনোর সময় প্লটের খানিকটা আভাস দিলেন। আমাকে—একজন লোক রাত্তিরে মার্কেট বন্ধ হয়ে যাবার পরে দেখে কী, সে ভিতরে আটকা পড়ে গেছে। লোকটা রিটায়ার্ড জজ—অনেককে ফাঁসিতে ঝুলিয়েছে। বোঝে। তপেশ–

এই বিশাল হগ সাহেবের বাজার, সব দোকান বন্ধ, সব বাতি নিভে গেছে, শুধু লিন্ডসে স্ট্রিটের দিকের কোলাপসিবল গেটের ভিতর দিয়ে আসা রাস্তার ক্ষীণ আলোয় যেটুকু দেখা যায়। গলিগুলোর এ মাথা থেকে ও মাথা খাঁ খাঁ করছে, আর তারই মধ্যে কেবল একটিমাত্র দোকান খোলা, একটা কিউরিওর দোকান, তাতে টিমটিমে আলো, আর তার ভিতর থেকে বেরিয়ে এল একটা কঙ্কাল, হাতে ছোরা!! খুনির কঙ্কাল, যে খুনিকে ফাঁসিকাঠে বুলিয়েছিলেন ওই জজ সাহেব। যে দিকেই পালাতে যান, মোড় ঘুরেই দেখেন সামনে সেই কঙ্কাল, হাতে ছোরা, ড্রিপিং উইথ ব্লাড!

আমি মুখে কিছু না বললেও মনে মনে বললাম ভদ্রলোক ভেবেছেন ভালই, তবে ফেলুদার হেলপ না নিলে গল্পের গোড়ায় গলদ থেকে যাবে; জজ সাহেবের আটকে পড়ার বিশ্বাসযোগ্য কারণ খুঁজে বার করা জটায়ুর সাধ্যের বাইরে।

সামনেই মোহনস-এর কাপড়ের দোকানের ডান পাশ দিয়ে ঢুকে, বাঁয়ে ঘুরে গুলাবের ঘড়ির দোকান পেরিয়ে ডাইনে একটু গেলেই একটা তেমাথার মোড়ে ইলেকট্রিক্যাল গুড়াসের দোকান। ব্যাটারি সেইখানেই পাওয়া যাবে, আর তার উলটাদিকেই পাওয়া যাবে রিফিল। দে ইলেকট্রিক্যালসের মালিক ফেলুদার ভক্ত, দেখেই একগাল হেসে নমস্কার করলেন।

আমাদের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই একজন লোক ঢুকলেন, তিনি গল্পে একটা বড় ভূমিকা নেবেন, তাই তাঁর বর্ণনা দিয়ে রাখি। বছর চল্লিশ বয়স, মাঝারি হাইট, ফরসা রং, মাথার চুল পাতলা, দাড়ি-গোঁফ নেই, সাদা বুশ শার্ট, কালো প্যান্ট আর হাতে একটা প্লাস্টিকের ব্যাগ।

আপনি মিস্টার মিত্র না? ভদ্রলোক ফেলুদার দিকে তাকিয়ে অবাক হেসে প্রশ্নটা করলেন।

আজ্ঞে হ্যাঁ।

ওই সামনের বইয়ের দোকানের লোক আমাকে চিনিয়ে দিল। বলল, উনি হচ্ছেন। ফেমাস ডিটেকটিভ প্রদাষ মিত্র। হাউ স্ট্রেঞ্জ! ঠিক আপনার কথাই ভাবছি আজ দু দিন থেকে।

বাংলায় সামান্য টান। হয়। ওদিকের লোক এদিকে সেটুলড়, না হয় এদিকের লোক ওদিকে।

কেন বলুন তো? ফেলুদা প্রশ্ন করল।

ভদ্রলোক কিছুটা নার্ভাস কি? গলাটা খাকরে নিয়ে বললেন, সেটা আপনার সঙ্গে দেখা করেই বলব। আপনি কাল বাড়ি থাকবেন কি?

বিকেল পাঁচটার পরে থাকব।

তা হলে আপনার অ্যাড্রেসটা যদি একটু—

ভদ্রলোক পকেট থেকে একটা নোটবুক আর ফাউনটেন পেন বার করে ফেলুদার হাতে দিলেন। ফেলুদা ঠিকানা লিখে দিল।

স্যরি!

ভদ্রলোকের সারি বলার কারণ আর কিছুই না, পেন থেকে সামান্য বেগুনি কালি লিক করে ফেলুদার আঙুলে লেগেছে। আমি জানি ফেলুদা পুরনো ধরনের ফাউনটেন পেনাই পছন্দ করে, বলে তাতে হাতের লেখা আরও ভাল হয়, কিন্তু মাঝে মাঝে লিংক করে বলে। ইদানীং ডট পেনিই ব্যবহার করছে।

আমার নাম বাটরা, পেন-খাতা পকেটে পুরে বললেন ভদ্রলোক, আমার গ্র্যান্ডফাদার ক্যালকাটায় সেটুল করেছিলেন সেভেনটি ফাইভ ইয়ারস আগে।

আই সি।

এর মধ্যেই মক্কেল জুটিয়ে ফেললেন নাকি?

ভদ্রলোক চলে যাবার পরমুহূর্তেই সামনের দোকান থেকে রিফিল কিনে এনে প্রশ্ন করলেন জটায়ু। ফেলুদা একটা নিঃশব্দ হাসি ছাড়া কোনও মন্তব্য করল না। তিনজনে রওনা দিলাম ডালমুটের উদ্দেশে।

লালমোহনবাবু পকেট থেকে ওঁর ছোট্ট লাল ডায়রিটা বার করে নোট নিতে শুরু করলেন। তার ফলে মাঝে মাঝে একটু পিছিয়ে পড়ছেন, আবার তৎক্ষণাৎ পা চালিয়ে আমাদের পাশ নিয়ে নিচ্ছেন। গতি সপ্তাহে একবার লোডশেডিং-এর মধ্যে এসে দেখেছি সারা মার্কেটটার উপরে যেন মৃত্যুর ছায়া নেমে এসেছে। আজি আলো থাকায় ভোল পালটে গেছে। পদে পদে কানে আসছে এ পাশ ও পাশ থেকে ছুড়ে মারা কী চাইলেন দাদা?-আর আমরা তারই মধ্যে একেবেঁকে এগিয়ে চলেছি ভিড় বাঁচিয়ে। ফেলুদার লক্ষ্য একটাই, কিন্তু দৃষ্টি ডাইনে বাঁয়ে সামনে তিন দিকে, যদিও তার জন্য ঘাড় ফেরাতে হয় না, চোখ ফেরালেই হল, আর তাতেই মনের মধ্যে অবিরাম ছাপা হয়ে যাচ্ছে ছবি আর কথা, যেগুলো পরে কখন কোন কাজে লাগবে কে জানে। আমি জানি লালমোহনবাবু অত কসরত করে খাতায় যা লিখছেন, ফেলুদার মাথায় আগেই তা লেখা হয়ে যাচ্ছে। সামনে পুজো, তাই ভিড় বেশি, তাড়া বেশি, কেনার তাদিগ বেশি, লোকের পকেটে পয়সাও নিশ্চয়ই বেশি।

লালমোহনবাবু বেশ সাহেবি কায়দায় কসমোপোলিটান কথাটা বলার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আমরা কলিমুদ্দির দোকানের সামনে এসে পড়লাম। এ দোকানও চেনা, সালাম বাবু বলে কলিমুদি তার কাজে লেগে গেল। দিব্যি লাগে দু হাতে ঠোঙা ধরে ঝাঁকিয়ে মেশানার ব্যাপারটা। আর সেই সঙ্গে টাটুকী, নোনতা, জিভে-জল আনা গন্ধ।

আমি গরম ঠোঙাটা হাতে নিয়েছি, এমন সময় দেখি ওয়ালেট থেকে টাকা বার করতে গিয়ে কী যেন একটা দেখে ফেলুদা একেবারে স্ট্যাচু।

কারণটা স্পষ্ট। আমাদের পাশ দিয়ে আমাদের সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে যে লোকটা এই মুহূর্তে মার্কেটের আরও ভিতর দিকে চলে গেল, সে হল মিঃ বাটরার ভূপলিকেট।

টুইনস, চাপা গলায় মন্তব্য করলেন জটায়ু।

সত্যি, যমজ ছাড়া এ রকম হুবহু মিল কল্পনা করা যায় না। তফাত শুধু শার্টের রঙে। এরটা গাঢ় নীল। হয়তো কাছ থেকে সময় নিয়ে দেখলে আরও তফাত ধরা পড়ত, কিন্তু সেও নিশ্চয়ই খুবই সূক্ষ্ম। অবিশ্যি আরেকটা তফাত এই যে ইনি ফেলুদাকে আদপেই চেনেন না।

এতে অবাক হবার কিছু নেই, ফেরাপথে রওনা দিয়ে বলল ফেলুদা, মিঃ বাটরার একটি যমজ ভাই থেকে থাকলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না।

সে আপনার নীলগিরি, বিন্ধ্য, আরাবলী, ওয়েস্টার্ন ঘাটুস—যাই বলুন না কেন, পাহাড়ের মাথায় যদি বরফ না থাকে তাকে আমি পাহাড়ই বলব না।

এবার পুজোয় পাহাড়ে যাবার কথাটা ক দিন থেকেই হচ্ছিল। নতুন উপন্যাস বেরিয়ে গেছে, লেখার তাগিদ নেই, তাই লালমোহনবাবু তার সেকেন্ড হ্যান্ড সবুজ অ্যাম্ব্যাসাডারে রোজই বিকেলে আসছেন আড্ডা দিতে। কাশ্মীরটা আমাদের কারুরই দেখা হয়নি, কিন্তু ওখানকার অকটোবরের শীত সহ্য হবে না সেটা বোধহয় নিজেই বুঝতে পেরে লালমোহনবাবু দু-একবার কাশ কাশ করে থেমে গেছেন। একটা অ্যাটলাস পড়ে আছে সামনের টেবিলে চা-ডালমুটের পাশে, সেটা খুলে বোধহয় ভারতবর্ষের ম্যাপটা একবার দেখার ইচ্ছে ছিল ভদ্রলোকের, এমন সময় কলিং বেল।

শ্রীনাথ আমাদের বাড়িতে চোদ্দ বছর কাজ করছে, তাই মিঃ বাটরা এসে বসার সঙ্গে সঙ্গে আরেক পেয়ালা চা এসে গেল।

আপনার কি কোনও যমজ ভাই আছে?

বাটরা কপালের ঘাম মুছে রুমালটা রাখার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই প্রশ্নটা করলেন লালমোহনবাবু।

মিঃ বাটরার ভুরু যে কতটা ওপরে উঠতে পারে, আর তলার ঠোঁট যে কতটা নীচে নামতে পারে সেটা এই এক প্রশ্নেই বোঝা গেল।

আপনারা.আপনারা কী করে...?

আপনার সঙ্গে দেখা হবার মিনিট পাঁচ-সাতের মধ্যেই নিউ মার্কেটেই তাকে দেখেছি আমরা, বলল ফেলুদা।

মিস্টার মিটারা – চেয়ারে প্রায় এক হাত এগিয়ে এসে হাতলে একটা জবরদস্ত চাপড় মেরে বললেন মিঃ বাটরা—আই অ্যাম দি ওনলি চাইলন্ড অফ মাই পেরেন্টস। আমার ভাইবোন কিছু নেই।

তা হলো–?

সেজন্যেই তো আপনার কাছে এলাম মিঃ মিটরা। এক উইকি হল এই ব্যাপারটা আরম্ভ হয়েছে। ফ্রম কাঠমাণ্ডু। আমি কাঠমাণ্ডুর একটা ট্র্যাভেল এজেন্সিতে কাজ করি।–সান ট্র্যাভেলস-আই অ্যাম দ্য পি আর ও। আমাকে কাজের জন্য ক্যালকাটা বোম্বাই দিল্লি যেতে হয় মাঝে মাঝে। আমার অফিসের কাছে একটা ভাল রেস্টোরান্ট আছে-ইন্দিরা-সেখানেই লাঞ্চ করি আমি এভরি ড়ে। লাস্ট ম্যানডে গেছি।-ওয়েটার বলছে, আপনি তো আধঘণ্টা আগে লাঞ্চ করে গেলেন, আবার কী ব্যাপার?–বুঝুন। মিঃ মিটরা। আরও দু-একজন চেনা লোক ছিল, তারাও বলল আমাকে দেখেছে। দেন। আই হ্যাঁড টু টেল দেম-কী আমি আসিনি। তখন ওয়েটার বলে কী, ওর সাসপিশন হয়েছিল, কারণ যে লোক খেতে এসেছিল, হি হাড় এ ফুল লাঞ্চ, উইথ রাইস অ্যান্ড কারি অ্যান্ড এভরিথিং; আর আমি খাই স্রেফ স্যান্ডউইচেজ অ্যান্ড এ কাপ অফ কফি।

মিঃ বাটরা দম নিতে থামলেন। আমরা তিনজনেই যাকে বলে উৎকর্ণ হয়ে শুনছি। লালমোহনবাবু বেশি মনোযোগ দিলে মুখ হাঁ হয়ে যায়, এখনও সেই অবস্থা! মিঃ বাটরা চায়ে একটা চুমুক দিয়ে আবার শুরু করলেন।

আমি কলকাতায় এসেছি। পরশু, সানডে। কাল সকলে হোটেল থেকে বেরোচ্ছি-আমি আছি গ্র্যান্ডে—ফ্র্যাঙ্ক রসে যাব টু বাইসাম অ্যাসপিরিন। আপনি জানেন বোধহয়, হোটেলের ভিতরেই একটা কিউরিওর দোকান আছে? সেইটের

পাশ দিয়ে যাবার সময় হঠাৎ শুনি ভিতর থেকে আমায় ডা মিঃ বাটরা, প্লিজ কাম ফর এ মোমেন্ট!—কীি ব্যাপার? গোলাম ভিতরে। সেলসম্যান একটা একশো টাকার নোট বার করে আমাকে দেখাচ্ছে। বলে-মিঃ বাটরা, আপনার এই নোটটা জাল নৌট, নো ওয়াটারমার্ক, প্লিজ। চেঞ্জ ইট —আমার তো মাথায় বাজ পড়ল মিঃ মিটরা! আমি তো দোকানে চুকিইনি! অ্যান্ড দে ইনসিসটেড, কি আমি গেছি আধা ঘণ্টা আগে, আর আমি ওই একশো টাকার নোট দিয়েছি ওদের, অ্যান্ড আই বট এ কুকরি!

কুকরি? মানে, নেপালি ছুরি? জিজ্ঞেস করলেন লালমোহনবাবু।

বুঝুন কী ব্যাপার। আমি থাকি কাঠমাণ্ডুতে; কলকাতায় এসে গ্র্যান্ড হোটেলের দোকান থেকে আমি নেপালের জিনিস কিনব কেন? নেপালে তো ও জিনিস আমি হাফ প্রাইসে পাব?

আপনাকে নোটটা বদলে দিতে হল? ফেলুদা প্রশ্ন করল।

অনেকবার বললাম, যে আই অ্যাম নট দ্য সোম পারসন। শেষকালে এমন ভাবে আমার দিকে চাইতে লাগল যেন আমি আইদার পাগল, অর ফোর টোয়েন্টি; এ অবস্থায় কী করা যায়, বলুন!

হুঁ...

ফেলুদা ভাবছে। হাতটা সাবধানে বাড়িয়ে চারমিনারের ডগা থেকে প্রায় এক ইঞ্চি লম্বা ছাইট অ্যাশট্রেতে ফেলে দিয়ে বলল, আপনি বেশ অসহায় বোধ করছেন সেটা বুঝতে পারছি।

আমার রেগুলার প্যানিক হচ্ছে, মিঃ মিটরা। সে যে কখন কী করবে তার ঠিক কী?

খুবই অদ্ভুত ব্যাপার, বলল ফেলুদা। —আপনার কথা আমার পক্ষে বিশ্বাস করাই কঠিন হত যদি না আমরা নিজের চোখে সে লোককে দেখতাম। কিন্তু

তাও বলতে বাধ্য হচ্ছি, আমি এ ব্যাপারে আপনাকে কীভাবে হেলপ করতে পারি সেটা ঠিক বুঝতে পারছি না।

ভদ্রলোকও চিন্তিতভাবে মাথা নেড়ে বললেন, সেটা ঠিক। এখন, আমি তো কাল কাঠমাণ্ডু ফিরে যাচ্ছি। ভরসা কী যে সে লোক আমার পিছে পিছে যাবে না, আর সেখানেও আমাকে হ্যাঁরাস করবে না? এ তো বুঝতে পারছি যে সে লোককে আমি না দেখলেও, সে আমাকে দেখেছে, আর ডেলিবারেটলি আমার পিছনে লেগেছে। দিস ইজ এ নিউ টাইপ অফ ক্রাইম, মিঃ মিটরা। এবারে হান্ড্রেড রুপিজের উপর দিয়ে বেরিয়ে গেছে, এর পরে কী হবে কে জানে?

বাইরের লোকের সঙ্গে কথা বলার সময় ফেলুদা এমনিতে পায়ের উপর পা তুলে বসে। যখন বোঝে আর কথা বলার নেই, বেশি বললে সময় নষ্ট হবে, তখন পা-টা এমন ভাবে নামিয়ে নেয় যে তাতেই বেশ বোঝা যায় এবার আপনি আসুন। আজও তাই করল, আর তাতে ফলও হল। মিঃ বাটরা উঠে পড়লেন। বুঝলাম কতকটা ভদ্রতার খাতিরেই ফেলুদা বলল, আশা করি কাঠমাণ্ডুতে গিয়ে কোনও অসুবিধায় পড়তে হবে না।

লেট আস হোপ সো, বললেন ভদ্রলোক। এনিওয়ে, আপনার সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল। আপনার খুব প্রশংসা শুনেছি মিঃ সর্বেশ্বর সাহায়ের কাছে।

সর্বেশ্বর সহায় ফেলুদার এক মক্কেল। কোডামযি থাকেন। হাজারিবাগে তাঁর একটা বাংলো প্রায়ই খালি পড়ে থাকে; আমরা একবার সেখানে গিয়ে ছিলাম দিন দশেক।

কাঠমাণ্ডুতে কোনও গোলমাল দেখলে আপনি পুলিশে খবর দিয়ে দেবেন, বলল ফেলুদা।এসব লোকের দরকার স্রেফ ধোলাই।

মিঃ বাটরা চলে যাবার পর লালমোহনবাবুই প্রথম মুখ খুললেন।

আশ্চর্য! ফরেন কাস্ট্রি বলেই বোধহয় এই হিল স্টেশনের কথাটা একবারও মাথায় আসেনি।

২

পরদিন সকালে যে ঘটনাটা ঘটল, বলা যেতে পারে সেটা থেকেই আমাদের এই অ্যাডভেঞ্চারের শুরু। অবিশ্যি সেটার বিষয়ে বলার আগে গতকাল রাত্রের টেলিফোনটার কথা বলা দরকার।

কলকাতায় অকটাবর মাসেও মাঝে মাঝে আকাশ কালো-টালো করে বৃষ্টি এসে যায়। কালও তাই হল। লালমোহনবাবু সাধারণত বিকেলে এলে আটটা-সাড়ে আটটা পর্যন্ত থাকেন; কাল সাতটা নাগাদ মেঘের গর্জন শুনে হন্তদন্ত হয়ে উঠে পড়লেন–বরঞ্চ কাল সকালে আসা যাবে, তপেশ। নিউ মার্কেটের প্লটটা আরও খানিকটা এগিয়েছে; তোমার একটা ও পিনিয়ন নেওয়া দরকার।

বৃষ্টি এল আটটায়, আর ফোনটা পৌনে নটায়। ফেলুদা ওর ঘরে এক্সটেনশনে কথা বলল, আর আমি বসবার ঘরের মেইন টেলিফোনে শুনলাম।

মিস্টার প্রদোষ মিত্র? ।

কথা বলছি।

ডিটেকটিভ প্রদোষ মিত্র?

আজ্ঞে হ্যাঁ। প্রাইভেট ইনভেসটিগেটর।

নমস্কার; আমার নাম অনীকেন্দ্র সোম। আমি বলছি সেন্ট্রাল হোটেল থেকে।

বলুন।

আপনার সঙ্গে একটু দরকার ছিল। একটু দেখা করা যাবে কি?

ব্যাপারটা জরুরি?

খুবই। আজ তো বাদলা, তবে কাল সকালে যদি একটু সময় দিতে পারেন। আমি বাইরে থেকে এসেছি, এবং আসার একটা প্রধান কারণ হল আপনার সঙ্গে দেখা করা। মনে হয় আপনি ব্যাপারটা শুনলে ইন্টারেস্টেড হবেন।

টেলিফোনে এর বেশি বলা যাবে না বোধহয়?

আজ্ঞে না। ভেরি স্যারি।

অ্যাপায়েন্টমেন্ট হল সকাল নটায়।কণ্ঠস্বরে বেশ ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়, বলল ফেলুদা। আমারও অবিশ্যি তাই মনে হয়েছিল। মনে মনে বললাম—সকলে বাটরা, বিকেলে সোম—মক্কেলের কিউ লেগে গেছে।

আজকাল ফেলুদার সঙ্গে আমিও যোগব্যায়াম করি। সকাল আটটার মধ্যে স্নান-টান সেরে দুজনেই সারা দিনের জন্য তৈরি। সাড়ে আটটায় লালমোহনবাবু ফোন করে বললেন, সেদিন নিউমার্কেটে একটা দোকানের উইন্ডেগতে নাকি একটা লাইট গ্রিন জার্কিন দেখেছেন, সেইটের দরটা জেনেই আমাদের বাড়িতে চলে আসবেন। বুঝলাম ভদ্রলোক হিল স্টেশনে যাবার তোড়জোড় আরম্ভ করে দিয়েছেন।

পৌনে দশটাতেও যখন অনীকেন্দ্র সোম এলেন না, তখন ফেলুদার হাত থেকে খবরের কাগজটা পাশে ফেলে মাথা নাড়ার ভাবটা দেখে বুঝলাম বাঙালিদের পাংচুয়ালিটির অভাব নিয়ে একটা তেতো মন্তব্য করার জন্য তৈরি হচ্ছে।

দশ মিনিটের মধ্যেই ফোনটা বেজে উঠল।

মার্ডার ভিকটিমের নোটবুকে আপনার ফোন নম্বর দেখছি কেন মশাই?

প্রশ্নটার মধ্যে একটা ভড়কে দেবার ভাব থাকলেও, আসলে সেটা যে হালকা মেজাজেই করা হয়েছে তা বুঝতে অসুবিধা হয় না; প্রশ্নকতা হচ্ছে জোড়াসাঁকো থানার ইন্সপেক্টর মহিম দত্তগুপ্ত।

ফেলুদার কপালে খাঁজ।

কে খুন হল?

চলে আসুন সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ। সেন্ট্রাল হোটেল। তেইশ নম্বর ঘর।

অনীকেন্দ্র সোম কি?

আপনার চেনা নাকি?

পরিচয় হবার কথা ছিল আজ সকালেই। কীভাবে খুন হল?

ছুরিকাঘাত।

কখন?

আর্লি মর্নিং। এলে সব জানতে পারবেন। আমি এসেছি। এই মিনিট কুড়ি।

আমি চেষ্টা করছি আধা ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে যেতে।

লালমোহনবাবু এলেন দশ মিনিট পরেই, তবে ঘরে ঢোকার আর সুযোগ পেলেন না। মার্ডার! বলে লালমোহনবাবুকে ঠেকে নিয়ে গিয়ে তাঁর গাড়িতে তুলে দিয়ে নিজে উঠে তাঁর পাশে বসে ফেলুদা ড্রাইভার হরিপদবাবুকে বলল, সেন্ট্রাল হোটেলে, চট-জলদি।

আপিসের ট্রাফিক, তার মধ্যেই যথাসম্ভব স্পিডে চলেছে আমাদের গাড়ি, আমি সামনে বসে একবার ঘাড় ঘুরিয়ে পিছনে দেখেই বুঝেছি লালমোহনবাবুর অবস্থা বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মতো। এটাও তিনি জানেন যে এ অবস্থায় ফেলুদাকে কোনও প্রশ্ন করেই কোনও উত্তর পাবেন না।

হোটেলে পৌঁছে যেটা জানা গেল তা মোটামুটি এই। রবিবার সন্ধ্যাবেলা অনীকেন্দ্র সোম এসে হোটেলে ওঠেন। খাতা থেকে জানা যাচ্ছে তিনি থাকেন। কানপুরে। আগামীকাল তাঁর চলে যাবার কথা ছিল। আজ ভোর পাঁচটায় নাকি একজন লোক এসে তাঁর খোঁজ করেন। তাঁকে বলা হয় সোম থাকেন তেইশ নম্বর ঘরে। দোতলার ঘর, তাই আগন্তুক লিফটে না উঠে সিডি দিয়েই ওঠেন, আর মিনিট পনেরো বাদেই নাকি চলে যান! চেহারার বর্ণনা হল—মাঝারি হাইট, পরিষ্কার রং, দাড়ি-গোঁফ নেই, পরনে ছাই রঙের প্যান্ট আর নীল বুশ শার্ট। দারোয়ান বলল যে ভদ্রলোক নাকি একটা ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে রেখেছিলেন।

মিঃ সোম আটটায় ব্রেকফাস্ট চেয়েছিলেন, রুমৰয় ঠিক সময়ে গিয়ে দরজার বেল টিপে কোনও সাড়া পায়নি। তারপর ডুপলিকেট চাৰি দিয়ে ঘর খুলে দেখে দরজার সামনেই পড়ে আছে মিঃ সোমের মৃতদেহ। অস্ত্রটা হচ্ছে একটা নেপালি কুকরি। সেটা মেরেছে বুকের মোক্ষম জায়গায়, এবং সেটাকে আর বার করা হয়নি।

তেইশ নম্বর ঘরে পুলিশ খানাতল্লাসি করছে, তবে জিনিস বলতে বিশেষ কিছুই নেই। একটি মাত্র ছোট ভি আই পি ব্যাগ, তাতে দিন-তিনেকের ব্যবহারের জন্য জামা-কাপড়। টাকা-পয়সা কিছুই পাওয়া যায়নি, অথাৎ ধরে নেওয়া যেতে পারে সেগুলো আততায়ীই সরিয়েছে। ফেলুদা লাশ দেখে এসে বলল ভদ্রলোক রীতিমতো সুপুরুষ ছিলেন, বয়স ত্রিশের বেশি নয়; রুমবয়ের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল মিঃ সোম সিগারেট খেতেন না, ড্রিংক করতেন না। রিসেপশনে বসেন মিঃ লতিফ, তিনি বললেন মিঃ সোম নাকি গতকাল বেশির ভাগ সময়টাই হোটেলের বাইরে ছিলেন, ফেরেন বৃষ্টি নামার ঘণ্টাখানেক আগে। আজ ভোরে ছাড়া ওঁর কাছে কোনও ভিজিটর আসেনি, কেউ টেলিফোনেও ওঁর খোঁজ করেনি। তবে হ্যাঁ, এই হোটেলের ঘরে টেলিফোন নেই, তাই মিঃ সোম নাকি কাল রাত্রে রিসেপশন থেকে ডিরেক্টরি দেখে একটা নম্বর বার করে কাকে যেন টেলিফোন করেন, এবং করার পর নিজের নোটবুকে নম্বরটা লিখে নেন।

যে নোটবুকে ফেলুদার নম্বরটা ছিল সেটা পাওয়া যায় খাট এবং বেডসাইড টেবিলের মাঝখানে মেঝেতে। নতুন কেনা নোটবুক, তার প্রথম তিনটে পাতাতেই শুধু লেখা। এলোমেলো টুকরো টুকরো কথা-বাংলা ইংরেজি মেশানো।কী মনে হচ্ছে বল তো?-একটা পাতা খুলে আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল ফেলুদা।

আমি বললাম, লেখা মাঝে মাঝে কেঁপে গেছে, বিশেষ করে ঘাঁটি কথাটা তো প্রায় পড়াই যায় না।

প্রচণ্ড নাভার্স টেনশনে লিখেছেন বলে মনে হয়, মন্তব্য করলেন জটায়ু।

অথবা প্রচণ্ড বেগে ধাবমান কোনও যানে, বলল ফেলুদা, ধরুন ঘণ্টায় ছশো মাইল।

বোঝাই যাচ্ছে ফেলুদা প্লেনের কথা বলছে। জেন্টপ্লেনের স্পিড গড়ে ঘণ্টায় ছশো মাইল হতে পারে।

আমার বিশ্বাস ঘাঁটি কথাটা লেখার সময় প্লেনটা একটা এয়ার পকেটে পড়েছিল, বলল ফেলুদা।

মোক্ষম ধরেছেন, বললেন জটায়ু, সেবার বম্বে যাবার সময় মনে আছে সবেমাত্র কফিতে চুমুক দিয়েছি—আর অমনি পকেট! সে মশাই কফি অন্ননালীতে না গিয়ে শ্বাসনালীতে ঢুকে বিষমা-টিষম লেগে এক কেলেঙ্কারি ব্যাপার।

ফেলুদা লেখাগুলো নিজের খাতায় টুকে নিয়ে নেটবুকটা মহিমবাবুকে ফেরত দিয়ে দিল।

আমরা কানপুরে জানিয়ে দিচ্ছি বললেন মহিম দত্তগুপ্ত, লাশ সনাক্ত করার একটা ব্যাপার আছে তো!

ফেলুদা বলল, আমার বিশ্বাস রাত্তিরে দিল্লি থেকে একটা ফ্লাইট আছে যেটা কানপুর হয়ে আসে; গত রবিবারের ফ্রাইটে অনীকেন্দ্র সোম নামে কোনও প্যাসেঞ্জার ছিল কি না সেটাও খোঁজ করে দেখতে পারেন। তবে আমার ধারণা লোকটা কোনও পাহাড়ি জায়গা থেকে আসছে।

কোন বলুন তো?

এক জোড়া মাউন্টেনিয়ারিং বুটস দেখলাম, তার একটার তলায় এক টুকরো ফার্ন লেগে রয়েছে, যেটা পাহাড়েই থাকা স্বাভাবিক।

মহিমবাবু বললেন নতুন কোনও তথ্য পেলেই জানিয়ে দেবেন, বিশেষ করে কুকরির হাতলে কোনও ফিংগার প্রিস্ট পাওয়া গেল কি না।

আর গ্র্যান্ড হোটেলে ঢুকেই প্যাসেজের বাঁদিকে একটা কিউরিওর দোকান আছে বলল ফেলুদা, খোঁজ করে দেখতে পারেন, কুকরিটা ওখান থেকেই কোনা হয়েছে কি না।

ফেরার পথে নোটবুকের তিনটে পাতায় যে লেখাগুলো ছিল সেগুলো দেখাল ফেলুদা।

প্রথম পাতায় দু লাইন লেখা–(১) only L S D কি? (২) ASK C P about methods and past cases.

দ্বিতীয় পাতায় তিন লাইন-(১) ঘাঁটি এখানে না। ওখানে? (২) A B সম্বন্ধে আগে জানা দরকার; (3) Ring up PCM, D. D. C.

তৃতীয় পাতায় শুধু আমাদের বাড়ির ফোন নম্বর।

ফরেন করেন্সি ঘটিত কোনও ব্যাপার নাকি মশাই? প্রশ্ন করলেন জটায়ু। মেট্রো ছাড়িয়ে চৌমাথায় লাল বাতিতে এসে থেমেছে আমাদের গাড়ি।

কেন বলুন তো?

না, ওই এল এস ডি দেখলাম কি না। পাউন্ড-শিলিং-পেন্স তো?

ফেলুদা—এল এস ডি হল এক রকম ড্রাগ। লাইসারাজিক অ্যাসিড ডাইয়েথিলামাইড। হিপিদের দৌলতে এর খ্যাতি এখন সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। আজকাল বৈজ্ঞানিকরা বলেন, মানুষের মগজে। সেরোটানিন বলে এক রকম রাসায়নিক পদার্থ আছে যেটা মানুষকে সুস্থ মস্তিষ্কে ভাবতে বুঝতে, চিন্তা করতে সাহায্য করে; এল এস ডি নাকি সেরোটানিনের মাত্রা সাময়িকভাবে কমিয়ে দিয়ে মস্তিষ্কের বিকার ঘটিয়ে দেয়। কিছুক্ষণের জন্য মানুষ তাই একটা অবাস্তব জগতে বিচরণ করে। ধরুন, এই চৌরঙ্গিকে মনে হতে পারে নন্দনকানন।

ব্বলেন কী! এ জিনিস কিনতে পাওয়া যায় নাকি?

তা যায় বইকী। তাই বলে কি আর দেজ মেডিক্যাল স্টোর্সে গিয়ে চাইলে পাবেন? এসব পাওয়া যায় গোপন আস্তানায়। গ্লোব সিনেমার পিছন দিকে হিপিদের একটা হোটেল আছে। সেখানে গিয়ে তাদের সঙ্গে মিশলে পরে এক-আধটা শুগার কিউব পেলেও পেতে পারেন।

শুগার কিউব?

চার চৌকো চিনির ডেলা দেখেননি? তার মধ্যে পোরা থাকে এক কণা এল এস ডি। এই এক কণার তেজ আপনার ভাষায় ফাইভ থাউজ্যান্ড হর্স পাওয়ার। অবিশ্যি এল এস ডি সেবন করে সাময়িক স্বর্গবাস নরকবাস দুই-ই হতে পারে। সেটা কে খাচ্ছে তার উপর নির্ভর কবে। সিঁড়ি নামছে মনে করে সততলার ছাতের কার্নিশে দাঁড়িয়ে শূন্যে পা বাড়িয়ে দিয়েছে এল এস ডি-র প্রভাবে এও শোনা যায়।

তার মানে পাপাত চ–?

অ্যান্ড মামার চ।

কী ভয়ঙ্কর।

৩

খুনটা হয়েছিল মঙ্গলবার সকালে। বিষ্যুদবার দুপুরে ফেলুদার ফোন এল মহিম দত্তগুপ্তর কাছ থেকে। খবর আছে অনেক।

অনীকেন্দ্র সোম কানপুরের আই আই টি-তে অধ্যাপনা করতেন। সেখানে তাঁর কোনও আত্মীয় থাকে না। তবে তাঁরা খবর পাঠান যে কলকাতায় অনীকেন্দ্র সোমের এক ভাই থাকে। সে নাকি স্টেট ব্যাঙ্কে চাকরি করে। পুলিশ তার হদিশ বার করে। ভদ্রলোক নাকি খবরের কাগজে তাঁর দাদার মৃত্যু-সংবাদটা মিস করে

গেছিলেন। যাই হাক, তিনি লাশ সনাক্ত করে যান, এবং বলেন যে অনীকেন্দ্রবাবু নাকি তাঁর আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে বিশেষ যোগাযোগ রাখতেন না। কলকাতায় প্রায় আসতেন না বললেই চলে। তবে দাদা একটু খামখেয়ালি হলেও, নির্ভীক, স্বাধীনচেতা পুরুষ ছিলেন সেটা ভাই স্বীকার করেন।

দু নম্বর-কুকরিতে কোনও আঙুলের ছাপ পাওয়া যায়নি। অর্থাৎ খুনি অত্যন্ত সাবধানি লোক। যে ভাবে যে অ্যাঙ্গেলে ছোরা বুকে ঢুকেছে, তাতে মনে হয় খুনি ন্যাটা বা লেফট-হ্যান্ডেড। গ্র্যান্ড হোটেলের কিউরিওর দোকানের মালিক ছোরাটা দেখে চিনেছেন এবং বলেছেন সেটা তাঁরা বিক্রি করেন সোমবার সকালে মিঃ বাটরা নামক এক ব্যক্তিকে। ইনি গ্র্যান্ড হোটেলেই ছিলেন, এবং যেদিন খুন হয় সেদিন ইন্ডিয়ান এয়ার লাইনসের সকাল নটার ফ্লাইটে চলে যান কাঠমাণ্ডু।

তিন নম্বর-কানপুর হয়ে আসা দিল্লির রবিবারের ফ্লাইটে অনীকেন্দ্র সোম বলে কোনও যাত্রী ছিলেন না। তবে রবিবারের অন্য সব ফ্লাইটের প্যাসেঞ্জার লিস্ট দেখে পুলিশ জেনেছে। যে সে দিন কাঠমাণ্ডু-ক্যালকাটা বিকালের ফ্লাইটে অনীকেন্দ্র সোম নামে একজন প্যাসেঞ্জার ছিলেন। এক ঘণ্টা লেট ছিল ফ্লাইটটা; সেটা এসে দমদমে পৌঁছায় সাড়ে পাঁচটায়।

মহিমবাবু শেষ কথা বললেন এই যে, খুনি যখন বিদেশে ভাগলওয়া, তখন এখান থেকে কিছু করার কোনও সোজা রাস্তা নেই। কেসটা আপাতত চলে যাচ্ছে সি আই ডি হোমিসাইডের হাতে। সেখান থেকে দিল্লির হাম ডিপার্টমেন্টে জানালে পর তারা আবার নেপাল সরকারের কাছে অনুরোধ জানাবেন এই খুনের তদন্তে সহায়তার জন্য। নেপাল সরকার সম্মতি জানালে পর এখান থেকে সি আই ডি-র লোক চলে যাবে কাঠমাণ্ডু।

ফেলুদা ফোনটা রাখার সময় শুধু একটি কথাই বলল–

বেস্ট অফ লাক্।

এর পর দুটো দিন ফেলুদার কথা একদম বন্ধ। তবে ও যে গভীরভাবে চিন্তা করছে সেটা ওর ঘনঘন পায়চারি, মাঝে মাঝে আঙুল মটকানো, আর হঠাৎ হঠাৎ বিছানায় চিত হয়ে শুয়ে পড়ে সিলিং-এর দিকে চেয়ে থাকা দেখেই বুঝতে পারছিলাম।

দ্বিতীয় দিন লালমোহনবাবু এসে প্রায় দু ঘণ্টা রইলেন, অথচ পুরো সময়টা ফেলুদা টেট্যালি মৌনী। ভদ্রলোক শেষটায় যা বলার আমাকেই বললেন, এবং মোদঃ ব্যাপারটা এই যে, উনি নাকি গতকাল এক আশ্চর্য পামিস্টের কাছে গিয়ে হাত দেখিয়ে এসেছেন।

বুঝলে ভাই তপেশী, ভদ্রলোকের নাম হচ্ছে মৌলিনাথ ভট্টাচার্য। শুধু যে দুর্ধর্ষ হাত-দেখিয়ে তা নয়, ওরিজিনাল রিসার্চ আছে। বলেন, মানুষের মতো বাঁদরের হাতেও নাকি রেখা থাকে, আর সে রেখা পড়া যায়। আমাদের চিড়িয়াখানায় একটা শিম্পাজি আছে। মৌলিবাবু কিউরেটরকে বলে স্পেশাল পারমিশন নিয়ে, যে লোকটা শিম্পাজিটার দেখাশোনা করে তাকে সঙ্গে নিয়ে ঢুকেছিলেন খাঁচার ভেতর। বললেন ভারী ভাব্য জানোয়ার। দশ মিনিট ধরে হাত বাড়িয়ে বসে ছিল, টু শব্দটি করেনি। কেবল বেরোবার সময় নাকি ভদ্রলোকের কাছাটা টেনে খুলে দেয়, হুইচ মে বি অনিচ্ছাকৃত। যাই হাক, হেড লাইন, লাইফ লাইন, হার্ট লাইন, ফেট লাইন-সব আছে ওই বাঁদরের হাতে; ওটা মারবে এইটটি-থ্রির অগাস্টে। অ্যাট দি এজ অফ থার্টি থ্রি। আমি ডায়রিতে নোট করে নিয়েছি। আমার তো মনে হয়। ফলে যাবে। তুমি কী বলো?

আমি বললাম, ফললে নিশ্চয়ই একটা অদ্ভুত ব্যাপার হবে। কিন্তু আপনাকে কী বললেন?

সে তো আরেক মজা। বছর পাঁচেক আগে কৈলাস বোস স্ট্রিটে এক পামিস্টকে হাত দেখিয়েছিলাম। তিনি বলেছিলেন ফরেন টয়ুর নেই। ইনি দেখিয়ে দিলেন স্পষ্ট রয়েছে। না হয়ে যায় না।

লালমোহনবাবু হতাশ হননি। পরদিনই সকলে চা খেতে খেতে ফেলুদা বলল, বুঝলি তোপ্‌সে, মন বলছে অল রোডস লিড টু নেপাল। আর তার মধ্যে কিছু রাস্তা বেশ সর্পিল। অতএব নেপাল যাওয়াটা ফেলুমিত্তিরের কর্তব্য।

ইন্ডিয়ান এয়ারলাইনসে কাঠমাণ্ডু ফ্রাইটে তিনজনের টিকিট কিনে, লণ্ডি থেকে গরম জামা আনিয়ে, পুষ্পক ট্র্যাভেলস-এর সুদর্শনবাবুকে দিয়ে ওখানকার হোটেল বুক করার কথা বলে দিয়ে আমাদের রওনা হতে আরও তিন দিন লেগে গেল।

এরই মধ্যে এক'দিন আমি ফেলুদাকে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার কি ধারণা নকল বাটরাও কাঠমাণ্ডু চলে গেছে?

ফেলুদা বলল, খুন করে দেশের বাইরে পালিয়ে যেতে পারলে একটা মস্ত সুবিধে আছে। শুনিলি তো মহিমবাবু কী বললেন-দুই দেশের সরকারের মধ্যে সমঝোতা না হওয়া পর্যন্ত তো খুনি নিশ্চিন্ত। যুক্তরাষ্ট্রে খুন করে অনেকে সীমানা পেরিয়ে পালিয়ে যায় মোকসিকোতে, শুনেছিস তো। ভারত আর নেপালও তো সেই একই ব্যাপার।

যাবার আগের দিন সকালবেলা লালমোহনবাবু এসে বলে গেলেন যে লেনিন সরণির মোড়ে নকল বাটরাকে দেখেছেন। সে নাকি একটা ঠাণ্ডাইয়ের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে লস্যি খাচ্ছিল। ফেলুদা চারমিনারে টান দিয়ে সিলিং-এর দিকে দৃষ্টি রেখে প্রশ্ন করল, গেলাসটা বাঁ হাতে ধরেছিল কি না সেটা লক্ষ করেছিলেন?

এই রে!

লালমোহনবাবু জিভ কেটে বুঝিয়ে দিলেন সেটা করেননি।তা হলে আপনার স্টেটমেন্টের কোনও মূল্য নেই, বলল ফেলুদা।

এয়ারপোর্টের কাউন্টারে ফেলুদার চেনা লোক ছিল। তিনি বললেন, আপনাদের ডানদিকে সিট দিচ্ছি, তা হলে ভাল ভিউ পাবেন।

ভাল ভিউটা যে কতটা ভাল সেটা যে না দেখেছে তাকে বলে বোঝানো মুশকিল। স্বপ্নেও কি ভাবা যায় যে কলকাতার মাটি ছেড়ে আকাশে ওঠার দশ মিনিটের মধ্যে ডানদিকে চেয়ে দেখতে পাব দূরে ঝলমল করছে আমাদের সেই ছেলেবেলা থেকে চেনা কাঞ্চনজঙ্ঘা?

আর তার পরেই অবিশ্যি শুরু হল সারা ডানদিকটা জুড়ে ভিড় করে দাঁড়িয়ে থাকা বিখ্যাত সব পর্বতশৃঙ্গ, যার অনেকগুলোই কোনও-না-কোনও সময়ে কোনও-না-কোনও দেশের বিখ্যাত পর্বতারোহী দলগুলোকে চুম্বকের মতো টেনে নিয়ে গেছে শেরপাদের দেশে, যেখান থেকে তারা থাড়াই-কেয়ার মেজাজে মরণপণে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। শৃঙ্গবিজয় অভিযানে।

ক্যাপ্টেন মুখার্জি যে এই প্লেনের অধিনায়ক সেটা আগেই ঘোষণা করা হয়েছিল। আমরা জানালা দিয়ে মন্ত্রমুগ্ধের মতো বরফের চূড়োগুলোর দিকে দেখছি, এমন সময় একজন বাঙালি এয়ার হাস্টেস এসে ফেলুদার উপর ঝুকে পড়ে বলল, ক্যাপ্টেন একবার আপনাকে ককপিটে ডেকেছেন।

ফেলুদা ওঠবার জন্য তৈরি হয়ে মেয়েটিকে বলল, আমার পরে এঁরা দুজনও একবার যেতে পারেন। কি?

এয়ার হাস্টেস হেসে বলল, আপনারা তিনজনেই আসুন না।

ককপিটে জায়গা খুবই কম, তবে ফেলুদার পিছনে দাঁড়িয়ে ওর কাঁধের দু দিক দিয়ে গলা বাড়িয়ে আমরা দুজনে যা দেখলাম। তাই যথেষ্ট। দেখে মনের যে ভাবটা হল সেটাকে লালমোহনবাবু পরে বলেছিলেন স্তব্ধভাষা রুদ্ধশ্বাস বিমুগ্ধ বিমূঢ় বিস্ময়। পর পর চূড়োর লাইন ডানদিক থেকে এসে বাঁয়ে ঘুরে প্লেন যেদিকে যাচ্ছে সেদিকে একটা প্রাচীর সৃষ্টি করেছে। দূরত্ব যতই কমে আসছে, শৃঙ্গগুলো ততই ফুলে ফেঁপে চাঙ্গিয়ে চিতিয়ে উঠছে। কো-পাইলটের হাতে একটা

হ্যাঁডলি চেজের বই, তিনি সেটাকে বন্ধ করে পর পর চূড়াগুলো চিনিয়ে দিলেন। কাঞ্চনজঙ্ঘার পরই মাকালু, আর তার দুটো চূড়ের পরেই এভারেস্ট। বাকিগুলোর মধ্যে যে নামগুলো আমার চেনা সেগুলো হল গৌরীশঙ্কর, অন্নপূর্ণ আর ধবলগিরি।

মিনিট পাঁচেক ককপিটে থেকে আমরা ফিরে এলাম। এক ঘণ্টা লাগে কাঠমাণ্ডু পৌঁছতে। এয়ার হাস্টেস চা দিয়েছিল, সেটা শেষ হতে না হতে বুঝতে পারলাম প্লেন নীচে নামতে শুরু করেছে। জানালা দিয়ে চেয়ে দেখি নীচে ঘন সবুজ ছাড়া আর কিছু দেখা যাচ্ছে না। এই সেই বিখ্যাত তেরাই; এর পরে মহাভারত পাহাড় পেরিয়েই কাঠমাণ্ডু ভ্যালি!

সামনে একটা বিশাল সাদা মেঘের কুণ্ডলী, আমাদের প্লেনটা তার মধ্যে ঢুকতেই বাইরের দৃশ্য মুছে গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে একটা ঝাঁকুনি শুরু হল।

মিনিটখানেক এই অবস্থায় চলার পর হঠাৎ মেঘ সরে গেল, ঝাঁকুনি থেমে গেল, আর ঝলমলে রোদে দেখতে পেলাম নীচে বিছিয়ে আছে এক আশ্চর্য সুন্দর উপত্যকা।

এ যে ফরেন কাস্ট্রি সে আর বলে দিতে হয় না মশাই ঢোক গিলে কানের তালা ছড়িয়ে অবাক চোখ করে বললেন লালমোহনবাবু।

কথাটা ঠিকই। ভারতবর্ষে এমন জায়গা নেই! পাহাড় নদী ধানখেত গাছপালা ঘরবাড়ি সবই আছে, কিন্তু তাও যেন একেবারে অন্য রকম।

গ্রামের বাড়িগুলো লক্ষ করা বলল ফেলুদা,চিনেদের তৈরি ইটের দোতলা বাড়ি, তার উপর খড়ের চাল। এ জিনিস আমাদের দেশে দেখতে পাবি না।

ওগুলো কি মন্দির নাকি মশাই?

বৌদ্ধমন্দির, বলল ফেলুদা।নদীর এ পারে, তাই মনে হয় ওটা পাটন শহর। আর ওইটে কাঠমাণ্ডু।

আমাদের প্লেনের ছায়াটা কিছুক্ষণ থেকেই সঙ্গে সঙ্গে চলছিল। লক্ষ করছিলাম সেটার বড় হওয়ার স্পিড় ক্রমেই বাড়ছে; এবারে সেটা যেন হঠাৎ তড়িঘড়ি ছুটে এসে বিরাট হয়ে আমাদের প্লেনের সঙ্গে মিশে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলাম আমরা ত্রিভুবন এয়ারপোর্টে ল্যান্ড করেছি।

৪

এয়ারপোর্টে বেশ চনমনে অভিজ্ঞতা হল। এ রকম বিদেশি টুরিস্টের ভিড় এর আগে একবারই দেখেছি, বোম্বের তাজমহল হোটেলের লবিতে।

আগেই জানতাম। এখানে কাস্টমস-এর ঝামেলা আছে, চেকিং-এর একটু বাড়াবাড়ি, সকলেরই সুটকেস নাকি খুলে দেখে। আমাদের কাছে আপত্তিকর কিছুই নেই, তাও লালমোহনবাবু দাঁতে দাঁত চেপে আছেন কেন জিজ্ঞেস করাতে বললেন, একটা টিফিন বক্সে কিছু আমসত্ত্ব এনিচি ভাই। ফরেন কাস্ট্রি, যদি সন্দেহ-টন্দেহ করে।

শেষ পর্যন্ত কাস্টমস কিছু বলল না দেখে লালমোহনবাবু একটা হাঁপ-ছাড়া হাসি হেসেই হঠাৎ আবার গভীর হয়ে গেলেন কেন সেটা ওঁর দৃষ্টি অনুসরণ করে বুঝতে পারলাম।

ফেলুদা আগেই দেখেছে লোকটাকে। একজন লালচে দাড়িওয়ালা শ্বেতাঙ্গ ঢ্যাঙ্গার সঙ্গে কথা বলছেন লাউঞ্জের কোণে দাঁড়িয়ে হয় নকল না হয় আসল বাটরা।

না, নকল নয়, আসল।

ফেলুদার সঙ্গে চোখাচেয়ুখি হওয়াতে ভদ্রলোক সাহেবকে এক্সকিউস মি বলে ভুরু কপালে তুলে হেসে এগিয়ে এলেন আমাদের দিকে।

ওয়েলকাম টু কাঠমাণ্ডু!

শেষ পর্যন্ত নিজেদের তাগিদেই এসে পড়লাম, বলল ফেলুদা।

ভেরি গুড, ভেরি গুড! তিনজনের সঙ্গেই হ্যান্ডশেক করলেন ভদ্রলোক। ফরচুনেটিলি, সে লোক বোধহয় আর আমাকে ফলো করেনি, মিঃ মিটরা। এ কী দিনে আর কোনও গোলমাল হয়নি। আপনারা কী দিন আছেন?

দিন সতেক?

কোথায় উঠছেন?

হোটেল লুম্বিনীতে রিজার্ভেশন আছে।

নতুন হোটেল, বললেন মিঃ বাটরা, অ্যান্ড কোয়াইট গুড। আপনার সাইট-সিইং-এ যেতে চাইলে আমি বন্দোবস্ত করে দিতে পারি; আমার আপিস আপনাদের হোটেল থেকে পাঁচ মিনিটের হাঁটা পথ।

থ্যাঙ্ক ইউ। ইয়ে-এ খবরটা আপনি দেখেছেন কি? কলকাতার কাগজ এখানে আসে?

ফেলুদা পকেট থেকে একটা কাটিং বার করে বাটরার হাতে দিল। আমি জানি এটা অনীকেন্দ্র সোমের খুনের খবর, স্টেটসম্যানে বেরিয়েছিল। তাতে এটাও বলা হয়েছিল যে খুনটা করা হয়েছিল একটা নেপালি কুকরির সাহায্যে।

আপনি যেদিন এলেন সেদিনকারই ঘটনা এটা।

মিঃ বাটরা খবরটা পড়ে কাগজটা থেকে চোখ তুলে গভীর সংশয়ের দৃষ্টিতে চাইলেন ফেলুদার দিকে। ফেলুদা বলল, কুকরিটা গ্র্যান্ড হোটেলের দোকান থেকে কেনা হয়েছিল খুনের আগের দিন সেটা পুলিশ ভেরিফাই করেছে! দোকানি এটাও বলে যে, যিনি কিনেছিলেন তার নাম বাটরা।

হাউ টেরিবল!

মিঃ বাটরার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে।

আপনি বোধহয় এই অনীকেন্দ্র সোমের নাম শোনেননি?

নেভার, কাটিংটা ফেরত দিয়ে বললেন মিঃ বাটরা।

ইনি কিন্তু একই প্লেনে এসেছিলেন। আপনার সঙ্গে।

ফ্রম কাঠমাণ্ডু?

আস্ত হ্যাঁ।

নেপাল এয়ারলাইনস?

হ্যাঁ।

তা হলে চেহারা দেখলে হয়তো চিনতে পারতাম। একশো ত্রিশজন প্যাসেঞ্জার ছিল ওই ফ্লাইটে, মিঃ মিটরা।

যাই হাক, আপনি আর এর মধ্যে কলকাতা-টলকাতা যাবেন না, তা হলে গোলমালে পড়তে পারেন, মোটামুটি হালকা ভাবেই বলল ফেলুদা।

কিন্তু আমাকে ফাঁদে ফেলার এ রকম চেষ্টা কেন, মিঃ মিটারা? প্রায় কাঁদো কাঁদো হয়ে বললেন মিঃ বাটরা।

ফেলুদা বলল, একজন ক্রিমিন্যাল যদি আবিষ্কার করে যে আরেকজন লোকের সঙ্গে তার চেহারায় খুব মিল, তা হলে তার নিজের ক্রাইমের বোঝাটা সেই লোকের ঘাড়ে ফেলার চেষ্টাটা কি তার পক্ষে খুব অস্বাভাবিক?

সে তো মানছি, কিন্তু এ তো সাধারণ ক্রাইম নয়, এ যে মার্ডার।

ফেলুদা বলল, আমার ধারণা খুনি কাঠমাণ্ডুতেই ফিরে আসবে, এবং আমার সঙ্গে তার একটা মাকাবিলা হবেই। এই অনীকেন্দ্র সাম কতকটা আমার সাহায্য চাইতেই কলকাতায় গিয়েছিলেন। কী কারণে সেটা আর জানা হয়নি। তার খুনি বেকসুর খালাস পেয়ে যাবে সেটা আমি মানতে পারছি না, মিঃ বাটরা। আমি অনুরোধ করব, আপনি বা আপনার কোনও লোক যদি তাকে কাঠমাণ্ডুতে দেখেন তা হলে আমি যেন একটা খবর পাই।

সেটা আমি কথা দিচ্ছি। আপনাকে বললেন মিঃ বাটরা। আমি কালকের দিনটা থাকছি। না, একটা অ্যামেরিকান টুরিস্ট দলের সঙ্গে পোখরা যেতে হচ্ছে, পরশু ফিরে এসে আপনাকে কনট্যাকটি করব।

কাস্টমসের ঝামেলা চুকিয়ে আমরা ট্যাক্সিতে করে রওনা দিলাম। জাপানি ডাটসুন ট্যাক্সি, রাস্তায় জাপানি ও বিদেশি গাড়ির ছড়াছড়ি, পরিষ্কার চওড়া রাজপথের ধারে ইউক্যালিপটাসের সারি; পোল্লায় পার্কের মধ্যে বাহারের স্পোর্টস স্টেডিয়াম, বিরাট বিরাট বিলিতি ধাচের বিল্ডিং—যার অনেকগুলোই নাকি আগে রাণাদের প্রাসাদ ছিল—দূরে এখানে-ওখানে মাথা উচিয়ে আছে হিন্দু-বৌদ্ধ মন্দিরের চূড়ো—সব মিলিয়ে ফরেন-ফরেন ভাবটা যে ক্রমে লালমোহনবাবুকে আরও বেশি করে পেয়ে বসছে সেটা তাঁর হাত কচলানি আর আধ-বোজা চোখ

দেখেই বুঝতে পারছিলাম। নেপালের রাজাই যে পৃথিবীর একমাত্র হিন্দু রাজা সেটা শুনে তিনি যেমন ইমপ্রেসড, তেমনই ইমপ্রেসড শুনে যে নেপালের লুম্বিনী শহরেই বুদ্ধের জন্ম, আর নেপাল থেকেই বৌদ্ধধর্ম গিয়েছিল চিন আর জাপানে!

শহরের মেইন রাস্তা কান্তি পথ দিয়ে বাঁয়ে ঘুরে একটা কারুকার্য করা তোরণের ভিতর দিয়ে আমরা এসে পড়লাম নিউ রোডে। এই নিউ রোডেই আমাদের হোটেল। দু দিকে দেখে বুঝলাম এটা দোকান আর হোটেলেরই পাড়া! লোকের ভিড়টাও এখানেই প্রথম চোখে পড়ল।

একটা চৌমাথার কাছাকাছি এসে আমাদের ট্যাক্সিট রাইট অ্যাবাউট টার্ন করে রাস্তার উলটাদিকে একটা বাহারের কাঠের ফ্রেমে কাচ বসানো দরজার সামনে থামল। একদিকের পাল্লার কাচে লেখা হোটেল, অন্য দিকে লুম্বিনী।

ফেলুদা এক'দিন বলছিল। ভ্রমণের বাতিকটা বাঙালিদের মধ্যে যেমন আছে, ভারতবর্ষের আর কোনও জাতের মধ্যে তেমন নেই; আর এই বাতিকটা নাকি মধ্যবিত্তদের মধ্যেই সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। সবচেয়ে আশ্চর্য এই যে, যাতায়াতের খরচ যত বাড়ছে, ভ্রমণের নেশাও নাকি বাড়ছে তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে।

কাঠমাণ্ডুতে এসেও যার সঙ্গে প্রথম আলাপ হল তিনি একজন বাঙালি টুরিস্ট। হোটেলের রিশেপসনে দাঁড়িয়ে খাতায় নাম লেখা হচ্ছে, এমন সময় ভদ্রলোক পাশের একটা সোফা থেকে উঠে এগিয়ে এলেন আমাদের দিকে।

আপনারা আই-এ ফ্লাইটে এলেন? লালমোহনবাবুকে বয়োজ্যেষ্ঠ দেখে তাকেই প্রশ্ন করলেন ভদ্রলোক।

আজ্ঞে হ্যাঁ। ইন্ডিয়ান এয়ারলাইনস। দশ মিনিট লেট ছিল।

এদিকে এই প্রথম?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

পারলে পোখরাটা একবার ঘুরে আসবেন। বেড়াতে এসেছেন তো?

আজ্ঞে হ্যাঁ। হলিডে, ফেলুদার দিকে একবার আড়-চোখে দেখে বললেন জটায়ু।

আপনি এখানে থাকেন? ফেলুদা প্রশ্ন করল। বেয়ারা এসে আমাদের মালপত্র নিয়ে গেছে দোতলায়। দুটো পাশাপাশি ঘর আমাদের।–দুশো ছাব্বিশ, দুশো সাতাশ।

আমি কলকাতার লোক, বললেন ভদ্রলোক, বেড়াতে এসেছি। ফ্যামিলি নিয়ে। ইনি অবিশ্যি এখানেরই বাসিন্দা।

আরেকজন বয়স্ক ভদ্রলোকও যে সোফাটায় বসে ছিলেন সেটা এতক্ষণ লক্ষ করিনি। চোখে কালো ফ্রেমের চশমা, টকটকে রং, চুল ধপধাপে সাদা। সব মিলিয়ে রীতিমতো সৌম্য চেহারা।

ভদ্রলোক এগিয়ে এসে আমাদের নমস্কার করলেন।

এনারা নেপালে আছেন প্রায় তিনশো বছর, প্রথম ভদ্রলোকটি বললেন।

বলেন কী! ফেলুদা ও জটায়ু একসঙ্গে বলে উঠল।

সে এক ইতিহাস। শুনে দেখবেন এঁর কাছে।

তা চলুন না। আমাদের ঘরে, বলল ফেলুদা। আমি এমনিতেই নেপালের বাঙালিদের সম্বন্ধে একটু ইনফরমেশন চাচ্ছিলাম, একটা বিশেষ দরকারে।

আমি জানি ফেলুদা কী দরকারের কথা বলছে, আর এটাও জানি যে দরকার না থাকলে ফেলুদা চন্ট করে কাউকে প্রথম আলাপেই নিজের ঘরে ডেকে এনে গপ্পো করে না।

দুশো ছাব্বিশ-টা ডাবল রুম, অর্থাৎ আমার আর ফেলুদার ঘর। সেখানেই বসে রুম সার্ভিসকে বলে আনানো চা খেতে খেতে কথা হল।

কাঠমাণ্ডুর বাসিন্দা ভদ্রলোকটির নাম হরিনাথ চক্রবর্তী। ত্রিভুবন কলেজের ইংরিজির অধ্যাপক ছিলেন, পাঁচ বছর হল রিটায়ার করেছেন। তিনি তাঁদের বংশের ইতিহাস যা বললেন তা হল এই–

প্রায় তিনশো বছর আগে নেপালে নাকি একবার প্রচণ্ড খরা হয়। এখানে তখন মল্লদের রাজত্ব। রাজা জগৎজয় মল্ল এক বিখ্যাত তান্ত্রিককে নিয়ে আসেন বাংলাদেশ থেকে, যদি তার তন্ত্রের জোরে তিনি খরা দূর করতে পারেন। এই তান্ত্রিক ছিলেন হরিনাথের পূর্বপুরুষ জয়রাম চক্রবর্তী। জয়রামের পুজোর জোরে নাকি কাঠমাণ্ডু উপত্যকায় এগারো দিন ধরে একটানা বৃষ্টি হয়। জগৎজয় মল্ল জমিজমা দিয়ে জয়রামকে সপরিবারে কাঠমাণ্ডুতেই রেখে দেন। পঁচিশ বছরে এক পুরুষের হিসেবে চক্রবর্তীরা কাঠমাণ্ডুতে দশ-পুরুষ ধরে আছেন। মল্লদের পরে রাণাদের আমলেও চক্রবর্তদের খাতির কমেনি, কারণ রাণারাও ছিলেন গোঁড়া হিন্দু। দুই পুরুষ আগে অবধি পুজো-আচ্চার কাজই চালিয়ে এসেছেন চক্রবর্তীরা। হরিনাথবাবুর এক কাকা এখনও পশুপতিনাথের মন্দিরের পূজারিদের একজন। হরিনাথের বাবা দীননাথই প্রথম কলকাতায় গিয়ে পড়াশুনা করেন। বিংশ শতাব্দীর গোড়ায়। ফিরে এসে তিনি রাণাদের ফ্যামিলিতে প্রাইভেট টিউশনি করেন বাহাত্তর বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত। হরিনাথবাবুও কলকাতায় লেখাপড়া করেন। তাঁর ছিল ইংরেজি সাহিত্যের দিকে ঝোঁক। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি এ আর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম এ পাশ করে তিনিও কাঠমাণ্ডু ফিরে এসে একই রাণা পরিবারে প্রাইভেট টিউশনি করেন। তার পর যখন রাণীদের প্রতিপত্তি চলে গিয়ে রাজা ত্রিভুবনের নামে কলেজ তৈরি হল, তখন হরিনাথ সেই কলেজে ইংরেজির অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন।

অবিশ্যি আমার ছেলেরা মন্ত্রতন্ত্র থেকে আরও দূরে সরে গিয়েছিল, তাঁর কাহিনী শেষ করে বললেন। হরিনাথ চক্রবর্তী। বড়টি-নীলাদ্রি ছিল মাউনটেনিয়ারিং ইনস্টিটিউটের শিক্ষক।

ছিল মানে?

সে সেভেনটি-সিক্সে পাহাড় থেকে পড়েই মারা যায়।

আর অন্যটি?

হিমাদ্রি করত নেপাল সরকারের চাকরি। হেলিকপটার পাইলট। তেরাই-এর জঙ্গল আর হিমালয়ের পিকগুলো দেখিয়ে নিয়ে আসত টুরিস্টদের। সেও ফাঁকি দিয়ে চলে গেছে আজ তিন হপ্তা হল।

এয়ার ক্র্যাশ?

ভদ্রলোক বিষণ্ণভাবে মাথা নাড়লেন।

তা হলে তো তবু এক রকম বীরের মৃত্যু হত। এক বন্ধুকে থ্যাংবোচে নিয়ে যায় সেখানকার মনাস্টরি দেখাতে। ফিরে এসে দেখে। কখন যেন হাতে একটা সামান্য ইনজুরি হয়েছে। কাউকে বলেনি, ডেটল লাগিয়ে চুপচাপ ছিল। শেষটায় ওর বন্ধুর চোখে পড়ে। তার ধারণা, একটা কাঁটাতারের বেড়া পেরোনোর সময় স্ক্র্যাচটা হয়েছে, সুতরাং কোনও রিস্ক না নিয়ে অ্যান্টি-টেট্যানাস ইনজেকশন নেওয়া উচিত। শেষটায় বন্ধুই ডাক্তার ডেকে এনে জোর করে ইনজেকশন নেওয়ায়।

তারপর?

ভদ্রলোক মাথা নাড়লেন।

কিছুই হল না। সেই টেট্যানাসেই মরল।

দেরি হয়ে গিয়েছিল কি ইনজেকশন নিতে?

দেরি আর কী করে বলি? বন্ধুটির হিসেবে বিকেলে জখমটা হয়েছে। পরদিন সকালে ইনজেকশন পড়েছে। কিন্তু ফল হল না। ইনজেকশনের কিছু পর থেকেই কনভালশন শুরু হল। এক দিনের মধ্যে সব শেষ।

ডাক্তার কি আপনার বাড়ির ডাক্তার? প্রশ্ন করল ফেলুদা।

বাড়ির ডাক্তার না হলেও, ডঃ দিবাকরকে আমরা যথেষ্ট চিনি। ইদানীং প্র্যাকটিসও বেড়েছে খুব-নতুন গাড়ি, বাড়ি—বোধহয় ডঃ মুখার্জি মারা যাবার পর থেকেই। মুখার্জি ছিলেন আমাদের ফ্যামিলি ফিজিশিয়ান।

এবার অন্য বাঙালি ভদ্রলোকটি একটি মন্তব্য করলেন।

ডাক্তারের কথা জিজ্ঞেস করে কী হবে? বরং ওষুধের কথা জিজ্ঞেস করুন। ওষুধে কাজ না দেওয়াটা আর আজকের দিনে কী আজব ব্যাপার মশাই? এ তো আকছার হচ্ছে। অ্যামপুলে জল, ক্যাপসুলে চুণ, চকখড়ি, এমনকী স্রেফ ধুলো—এ সব শোনেননি?

হরিনাথবাবু একটা শুকনো হাসি হাসলেন।

বেশির ভাগ লোকে আপনার কথাটাই বলবে। আজকের যুগে সব কিছু মেনে নেওয়া ছাড়া গতি নেই। আমাকেও মেনে নিতে হল!

ভদ্রলোক উঠে পড়লেন, আর সেই সঙ্গে অন্যটিও, র‍্যার নাম এখনও জানা হয়নি।

আপনার অনেকটা সময় নষ্ট করে গেলাম, ফেলুদার দিকে ফিরে বললেন। হরিনাথ চক্রবর্ত, কিছু মনে করবেন না।

মোটেই না, বলল ফেলুদা, শুধু একটা কথা জানার ছিল।

বলুন।

আপনার ছেলের বন্ধুটি কি এখন এখানে?

না। তবে কোথায় তা বলতে পারব না। ভয়ানক শক পেয়েছিল হিমুর মৃত্যুতে। তাকে বললাম, কপালের লিখন খণ্ডায় কার সাধ্যি! সে আমার সঙ্গে কথা বন্ধ করে দিল। আমার বাড়িতেই ছিল। দিন আষ্ট্রেক হল এক'দিন দেখি কোথায় যেন চলে গেছে। অবিশ্যি ফিরে সে আসবেই। কারণ তার কিছু জিনিসপত্র এখনও রয়ে গেছে আমার বাড়িতে। দশ বছর এক ইস্কুলে, এক কলেজে পড়েছে দুজনে।

তার নামটা?

অনীক বলে ডাকি। অনীকেন্দ্র সোম।

৫

আধঘণ্টার মধ্যে স্নান সেরে নিয়ে তিনজনে একতলায় গেলাম হোটেলেরই নিরভানা রেস্টোর‍্যান্টে লাঞ্চ খেতে। কাঠমাণ্ডুতে আসার এত অল্প সময়ের মধ্যেই ঘটনা একটা বিরাট ধাপ এগিয়ে গেছে ভাবতে মনের মধ্যে একটা চাপা উত্তেজনার ভাব এসে গেছে, আর সেই সঙ্গে খিদেটাও পেয়েছে জবর। কলকাতায় অনীকেন্দ্র সোম খুন, নেপালে বাঙালি হেলিকপটার পাইলটের মৃত্যু, মিঃ বাটরার ডুপলিকেট—এ সবই যে এক সঙ্গে জট-পাকানো তাতে কোনও সন্দেহ নেই। মিঃ সোম কি চেয়েছিলেন ফেলুদা ওঁর বন্ধুর মৃত্যুর ব্যাপারেই তদন্ত করুক? ইনজেকশনে ভেজাল ছিল বলেই কি হিমাদ্রি চক্রবর্তীর মৃত্যু হয়? কিন্তু এ ব্যাপারে ফেলুদা আর কত দূর কী করতে পারে?

আমরা দুজনে মোটামুটি চেনাশোনা খাবার অর্ডার দিয়েছি, কিন্তু লালমোহনবাবু হঠাৎ কেন যেন মেনু দেখে ওয়েটারকে জিজ্ঞেস করে বসলেন, হায়াট ইজ মোমো?

ইটস মিট বলস ইন সস, স্যার, বলল ওয়েটার। তরল পদার্থে ভাসমান মাংসপিণ্ড, বলল ফেলুদা। তিব্বতের খাবার। শুনেছি। মন্দ লাগে না খেতে। ওটা খেলে আপনি কলকাতায় গিয়ে বলতে পারেন যে দলাই লামা যা খান, আপনিও তাই খেয়ে এসেছেন।

দেন ওয়ান মোমো ফর মি, ইফ ইউ প্লিজ।

এছাড়া অবিশ্যি ভাত আর ফিশকারি অর্ডার দিয়েছেন। ভদ্রলোক। বললেন, মেমোটা ফর একসপিরিয়েন্স।

একটা হালকা সবুজ রংয়ের কার্ড হাতে নিয়েই রেস্টোর‍্যান্টে ঢুকেছিলেন লালমোহনবাবু, এবার সেটা ফেলুদার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, এইটে যে ধরিয়ে দিল হাতে হোটেলের কাউন্টারে, এর মানেটা কিছু বুঝলেন? আমি তো

মশাই হেড অর টেল কিছুই বুঝছি না। ক্যাসিনো কথাটা চেনা চেনা লাগছে, কিন্তু ব্ল্যাকজ্যাক, পনীটুন, রুলেট, জ্যাকপট—এগুলো কী? আর বলছে এই কার্ডের ভ্যালু নাকি পাঁচ ডলার। তার মানে তো চল্লিশ টাকা। ব্যাপারটা কী বলুন তো।

আমিই লালমোহনবাবুকে বুঝিয়ে দিতে পারতাম, কিন্তু ফেলুদা আরও গুছিয়ে বলতে পারবে বলে ওর ওপর ছেড়ে দিলাম।

এখানে একটা বিখ্যাত হোটেল আছে বলল ফেলুদা।নানা রকম জুয়া খেলার ব্যবস্থা আছে সেখানে। জ্যাকপট, পানীটুন, কিনো—এ সবই এক-এক রকম জুয়ার নাম। আর খেলার জায়গাটাকে বলে ক্যাসিনো। আমাদের দেশে এ ধরনের পাবলিক গ্যাম্বলিং নিষিদ্ধ, তাই ক্যাসিনো জিনিসটা পাবেন না। এই কার্ডটা নিয়ে ক্যাসিনোতে গিয়ে আপনি পাঁচ ডলার পর্যন্ত জুয়া খেলতে পারেন, নিজের পকেট থেকে পয়সা না দিয়ে।

লেগে পড়ব নাকি, তপেশ?

আমার আপত্তি নেই।

নাকের সামনে মুলোর টোপ ঝোলালে গাধা কি আর না খেয়ে পারে?

খেলার শেষে নিজেকে গর্দভ গর্দভ মনে হতে পারে সেটা কিন্তু আগে থেকে বলে দিচ্ছি, বলল ফেলুদা।অবিশ্যি জ্যাকপটে এক টাকা দিয়ে হাতলের এক টানে পাঁচশো টাকা পেয়ে গেছে এমনও শোনা যায়।

ঠিক হল এক'দিন সন্ধেবেলা গিয়ে দেখে আসা যাবে ক্যাসিনো ব্যাপারটা। হোটেল থেকেই বার-তিনেক বাস যায়। সেখানে, তার জন্য আলাদা পয়সা লাগে না।

মোমো খেয়ে লালমোহনবাবু বললেন যে এর পাকপ্রণালীটাি জেনে নেওয়া দরকার। ওঁর রান্নার লোক বসন্ত নাকি খুব এক্সপার্ট—উইকে এক'দিন করে মোমো খেতে পারলে মশাই ছ। মাসের মধ্যে চেহারায় একটা ধ্যানী ভাব

এসে যাবে। রাস্তায় বেরোলে পাড়ার ছোঁড়াগুলো যে মাঝে মাঝে ফ্যাচ ফ্যাচ করে হাসে, সেটা বন্ধ হয়ে যাবে।

মনে মনে বললাম যে লালমোহনবাবু যখন মাঝে মাঝে ধ্যানী ভাব আনার চেষ্টা করেন, তখনই ওঁকে দেখে সবচেয়ে বেশি হাসি পায়।

তবে কাঠমাণ্ডুতে কেউ হাসবে না সেটা ঠিকই।

দুপুরে খাওয়ার পর নিউ রোড ধরে দক্ষিণ দিকে যেতে যেতে মনে হল, দেশি-বিদেশি এত জাতের লোক—নেপালি তিব্বতি পাঞ্জাবি সিন্ধি মারোয়াড়ি, জামান সুইডিশ ইংলিশ আমেরিকান ফ্রেঞ্চ—আর এত রকম ঘর বাড়ি দালান দোকান মন্দির হোটেলের এ রকম সাড়ে বত্রিশ ভাজা পৃথিবীর আর কোথাও আছে কি না সন্দেহ।

ফেলুদা বলল আমরা যেখানে যাচ্ছি—দরবার স্কোয়ার—যেটাকে বলা চলে কাঠমাণ্ডুর নার্ভ সেন্টার, যেমন চৌরঙ্গি ধর্মতলার মোড় কলকাতার—সেইখানেই নাকি এখানকার পুলিশ ঘাঁটি। ওকে একবার সেখানে যেতে হবে। আমরা ততক্ষণ চারপাশটা ঘুরে দেখব। আধঘণ্টা পরে একটা বাছাই করা জায়গায় আমরা আবার মিট করব।

হোটেল থেকে বেরিয়ে খানিকটা গিয়েই একটা চৌমাথা পড়ে, তারপর থেকে নিউ রোডের নাম হয়ে গেছে গঙ্গা-পথ। তারপর খানিকটা গিয়ে রাস্তাটা চওড়া হয়ে গেছে। এটা হল বসন্তপুর স্কোয়ার। ডাইনে পুরনো রাজার প্যালেস। সেটা ছাড়িয়ে ডাইনে ঘুরতেই বুঝে গেলাম দরবার স্কোয়ারে এসে গেছি, আর এমন একটা বিচিত্র জায়গা আমরা এর আগে কখনও দেখিনি।

লালমোহনবাবু বার তিনেক এ কোথায় এলাম মশাই বলতে ফেলুদা আর থাকতে না পেরে বলল, আপনার প্রশ্নের যে উত্তরটা এক কথায় হয়, যেটা আপনি ম্যাপ খুলেই পেতে পারেন, সেটা আপনি নিশ্চয়ই চাচ্ছেন না। আর অন্য যে উত্তর, সেটা সোজা গদ্যে বলার জিনিস নয়। আপাতত আপনাকে অ্যাডভাইস

দিচ্ছি—চোখ-কান সজাগ রেখে মনপ্রাণ ভরে দেখে নিন। প্রাচীন শহরের এমন চেহারা। আপনি ভারতবর্ষের কোথাও পাবেন না। এক পেতে পারেন। কাশীর দশাশ্বমেধে, কিন্তু তার মেজাজ একেবারে আলাদা।

সত্যিই, যেদিকে চাই সেদিকেই চমক। দাবা খেলা কিছুক্ষণ চলার পর যেমন ছকের উপর রাজা মন্ত্রী বড়ে গজ নীকো সব ছড়িয়ে বসে থাকে, তেমনই কোনও খামখেয়ালি দানব যেন এই সব ঘর বাড়ি প্রাসাদ মন্দির মূর্তি স্তম্ভ ছড়িয়ে বসিয়ে দিয়েছে। আর তারই মধ্যে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য মানুষ আর যানবাহন। কাশীর কথা যে মনে পড়ে না তা নয়, কিন্তু কাশীর আসল মন্দিরগুলো সব গলির মধ্যে হওয়াতে সেগুলো আর দূর থেকে দেখার কোনও উপায়। থাকে না। এখানে কিন্তু তা নয়। রাস্তা দিব্যি চওড়া। পুরনো প্যালেসের বারান্দায় এসে রাজা দর্শন দিতেন বলে অনেকখানি খোলা জায়গা রাখা আছে।

ম্যাপ অনুযায়ী একটু এগিয়েই কালভৈরবের মূর্তি, বলল ফেলুদা। ওই মূর্তির সামনে আধঘণ্টা পরে তোদের মিট করছি।

ফেলুদা পা চালিয়ে এগিয়ে গেল।

নেপালের কাঠের কাজ প্রসিদ্ধ সেটা আগেই শুনেছিলাম, সেটা যে কেন, এখানে এসে বুঝতে পারলাম। পুরনো বাড়িগুলোর জানালা দরজা বারান্দা, ছাত, সবই কাঠের তৈরি, আর তার কারুকার্য দেখলে মাথা ঘুরে যায়। এখানকার মন্দিরগুলোও কাঠের, আর তেমন মন্দির আর কোথাও দেখিনি। এমনিতে ভারতবর্ষের ধাঁচের হিন্দু মন্দিরও আছে, কিন্তু আসল হল যেগুলোকে গাইড বুকে বলে প্যাগোডা। দো-চালা, তিন-চালা, চার-চালা মন্দির, চওড়া থেকে ধাপে ধাপে ক্রমে সরু হয়ে উপর দিকে উঠেছে।

তবে দরবার স্কোয়ার শুধু ধর্মস্থান নয়, বাজারও বটে। রাস্তায় ফুটপাথে সিঁড়িতে বারান্দায়—সব জায়গায় জিনিস ফেরি হচ্ছে। শাকসবজি ফলমূল থেকে ঘটি-বাটি জামা-কাপড় অবধি। এখানকার নেপালিরা যে টুপি ব্যবহার করে, তার

মধ্যে বেশ বাহার আছে। এক জায়গায় সেই টুপি বিক্রি হচ্ছে দেখে দুজনে সেদিকে এগিয়ে গেলাম। কলকাতার নিউ মার্কেট থেকে জটায়ুর মন এখন কাঠমাণ্ডুর বাজারে চলে এসেছে, সেটা বুঝতে পারলাম ভদ্রলোককে তাঁর লাল ডায়রিটা বার করতে দেখে।

টুপির শেপা সবই এক; কিন্তু নকশা প্রত্যেকটাতে আলাদা। আমি নিজে একটা বাছাই করে দর করছি, এমন সময় পিছন থেকে চাপা গলা পেলাম জটায়ুর।

তপেশ!

নামটা কানে আসতেই ঘুরে দেখি ভদ্রলোক কী যেন দেখে তটস্থ হয়ে গেছেন।

ওঁর দৃষ্টি অনুসরণ করে ডাইনে মুখে ঘোরাতেই দেখলাম—

হাত পঁচিশেক দূরে দাঁড়িয়ে বাটরা বা নকল বাটরা আমাদের দিকে পাশ করে সিগারেট ধরিয়ে হাঁটতে শুরু করল। ডানদিকে একটা গলি লক্ষ্য করে।

তোমার দাদাকে বাঁ হাতে লাইটার ধরাতে দেখেছি কখনও?

না।

ইনি ধারালেন।

দেখেছি। আর বাঁ পকেটে রাখলেন লাইটারটা।

ফলো করবে?

আপনাকে দেখেছে লোকটা?

মনে তো হয় না।

রোখ চেপে গেল। ফেলুদার সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্টের আরও বিশ মিনিট দেরি।

দুজনে এগিয়ে গেলাম।

সামনে একটা মন্দিরের চারপাশে ভিড়। লোকটা হারিয়ে গেছে ভিড়ের মধ্যে। মন্দিরটা পেরোতেই আবার দেখতে পেলাম তাকে। সে এবার গলিটার মধ্যে ঢুকেছে। প্রায় বিশ হাত তফাত রেখে আমরা তাকে অনুসরণ করে চললাম।

গলিটার দু দিকে দোকান, ছোট ছোট হোটেল, রেস্টোর‍্যান্ট। পাই শপ কথাটা অনেক রেস্টোরান্টের গায়েই লেখা রয়েছে।কলকাতায় পাইস হোটেল ছিল এককালে বলে জানি, চাপা গলায় মন্তব্য করলেন লালমোহনবাবু, পাই শপ তো কখনও শুনিনি।

আমি বললাম, এ পাই টাকা-আনা-পাই না; পাই একরকম বিলিতি খাবার।

একদল হিপি আসছে। গলিতে পাঁচমিশালি গন্ধ, তার বেশির ভাগটাই খাবারের। কয়েক মুহূর্তের জন্য একটা নতুন গন্ধ যোগ হল যখন হিপির দলটা আমাদের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। গাঁজা, ঘাম আর অনেক দিনের না-ধোয়া জামা-কাপড়ের গন্ধ।

এই রে!

কথাটা লালমোহনবাবু বলে উঠেছেন, কারণ লোকটা ডাইনে একটা দোকানের মধ্যে ঢুকে পড়েছে।

কী করব। এবার? লোকটা আবার বেরোবে নিশ্চয়ই। অপেক্ষা করব? যদি দেরি করে? হাতে আর পনেরো মিনিট সময়। বললাম, চলুন যাই গিয়ে ঢুকি দোকানে। সে তো আমাদের চেনে না, ভয়টা কীসের?

ঠিক বলেছি।

তিব্বতি হ্যান্ডিক্র্যাফটের দোকান। মাঝারি দোকান, দরজা দিয়ে ঢুকেই সামনে একটা কাউন্টার। তার পাশে ফাঁক দিয়ে দোকানের পিছন দিকে যাওয়া যায়! পিছনে দরজা, তারও পিছনে একটা অন্ধকার ঘর।

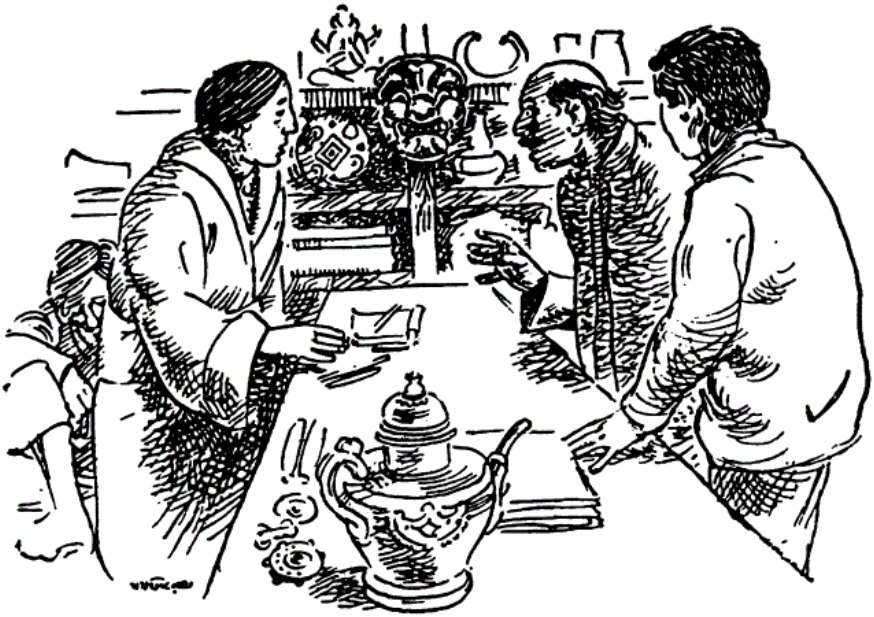

সেই ঘরেই হয়তো গিয়ে থাকবেন নকল বাটরা, কারণ আর কোনও যাবার জায়গা নেই।

ইয়েস?

কাউন্টারের পিছনে দাঁড়ানো তিব্বতি মহিলা হাসিমুখে আমাদের দিকে চেয়ে প্রশ্নটা করলেন। তার পিছনে একটি মাঝবয়সি তিব্বতি পুরুষ, গালে অসংখ্য বলিরেখা, একটা চোখ একটু ছোট, বেঞ্চিতে বসে আছে ঝিম ভাব নিয়ে।

আমরা দোকানে ঢুকে পড়েছি, তাই মহিলার প্রশ্নের উত্তরে কিছু বলা দরকার। কিছু দেখতে চাইতে হবে, যেন কিনতে চাই এমন ভাব করে। জিনিসের অভাব নেই দোকানে—মুখোশ, তাংখা, জপ যন্ত্র, তামার ঘটিবাটি, ফুলদানি, মুর্তি।

আই লাইক মোমো, হঠাৎ কী কারণে যেন বলে বসলেন লালমোহনবাবু।

মেমো ইউ গেট ইন টিবেটান রেস্টোরান্ট, নট হিয়ার।

ইংরেজিটা মোটামুটি ভালই বলেন মহিলা।

নো নো নো, বললেন লালমোহনবাবু, মানে, আই ডোন্ট ওয়ন্ট টু ইট মোমো। মহিলার ভুরু বিশেষ না থাকলেও, যেটুকু আছে সেটুকু উপর দিকে উঠে গেছে।ইউ লাইক মোমো, অ্যান্ড ইউ ডোন্ট ওয়ন্ট টু ইট মোমো?

নো নো—মনে, নট নাউ। ইন হোটেল আই এট মোমো। নাউ আই ওয়ন্ট টু, মানে, নো হাউ—মানে...

এর কোনও শেষ নেই, অথচ ভদ্রলোক কী বলতে চাইছেন সেটা বেশ বুঝতে পারছি।

লালমোহনবাবুর পিঠে হাত দিয়ে ওঁকে থামিয়ে দিয়ে বললাম,ডু ইউ হ্যাভ এ টিবেটান কুব-বুক?

আমি জানতাম। এ জিনিসটা দোকানে থাকবে না। মহিলাও মাথা নেড়ে স্যারি বলে বুঝিয়ে দিলেন নেই।

থ্যাঙ্ক ইউ বলে বেরিয়ে এলাম দুজনে। হাতে মিনিট আষ্টেক সময়। নকল-বাটিরা-উধাও রহস্যটাকে হজম করে যে পথে গিয়েছিলাম। সে পথে ফিরে এসে একজন লোকের কাছ থেকে দুটো নেপালি ক্যাপ কিনে সেগুলো মাথায় চাপিয়ে কিছুটা এগিয়ে গিয়েই দেখি পৌঁছে গেছি। কালভৈরবের মূর্তির সামনে।

বাপরে কী ভয়াবহ মূর্তি! দিনের বেলা দেখেই গা শিউরে ওঠে, আর রাত্তিরে যখন লোক থাকে না তখন দেখলে না জানি কী হবে। এর কাছেই কোথায় যেন আবার একটা শ্বেতভৈরবের মূর্তি আছে, সেটাও এক সময় এসে দেখে যেতে হবে।

ফেলুদা এল মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই। থানার ফটক মূর্তির ঠিক সামনেই।

আমরা দুজনেই নকল বাটরার ঘটনাটা বলার জন্য উদ্‌গ্রীব, কিন্তু ফেলুদার কী বলার আছে সেটা জানা দরকার, সে যে কেন থানায় গিয়েছিল সেটাই জানি না। বলল, দিব্যি লোক ও সি মিঃ রাজগুরুং। বললেন নেপাল

সরকার যদি ভারত সরকারের অনুরোধ রাখতে রাজি হয়, তা হলে মিঃ সোমের আততায়ীকে ধরার ব্যাপারে। এরা সব রকম সাহায্য করবেন।

দ্যাট ম্যান ইজ হিয়ার, ফেলুবাবু! আর চাপতে না পেরে বলে ফেললেন জটায়ু।

আমি ব্যাপারটা আরেকটু খুলে বললাম।

তুই ঠিক দেখেছিস বাঁ হাতে লাইটার ধরাল?

আমরা দুজনেই দেখেছি! বললেন জটায়ু।

ভেরি গুড, বলল ফেলুদা।মিঃ বাটরাকে কাল খবরটা দিতে হবে। ইয়ে, তোরা বরং বাজার-টাজার একটু ঘুরে দেখ, আমার হোটেলে গিয়ে দু-একটা ফোন করার আছে।

বুঝলাম কাঠমাণ্ডুতে এসে সাইট-সিইং ব্যাপারটা খুব বেশি হবে না ফেলুদার।

৬

আমাদের হোটেল থেকে বেরিয়েই যে চৌমাথার কথা বলেছিলাম, সেটা দিয়ে ডাইনে ঘুরলে পড়ে শুক্র পথ। এই শুক্র পথ দিয়ে কিছু দূর গেলেই এখানকার সুপার মার্কেট। একটা বেশ বড় ছাতওয়ালা চত্বরের চারদিক ঘিরে দোকানের সারি। কোনটা যে কীসের দোকান বোঝা মুশকিল, কারণ প্রায় সবকটাতেই সব কিছুই পাওয়া যায়। জামাকাপড় ঘড়ি ক্যামেরা রেকর্ডার রেডিয়ো ক্যালকুলেটার কলম পেনসিল টফি চকোলেট—কী না নেই, আর সবই অবশ্য বিদেশি জিনিস।

ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করছে ভাই তপেশী, একটা দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন লালমোহনবাবু।

কেন?

এসব দোকান কি আর আমাদের জন্যে? এখানে আসবে জন ডি রকফেলার, কি বোম্বাইয়ের ফিল্ম স্টার!

শেষ পর্যন্ত আর লোভ সামলাতে না পেরে পৌনে দু মিটার জাপানি টেরিউলের ট্রাউজারের কাপড় কিনে ফেললেন লালমোহনবাবু।এই গেরুয়া টাইপের রংটা লামাদের দেশে মানাবে ভাল, কী বলো তপেশ?

আমাকে বাধ্য হয়ে বলতে হল। লামাদের দেশটা আসলে হল তিব্বত, নেপালের শতকরা আশি ভাগ লোকই হিন্দু।

ট্রাউজারস আগামীকাল বিকেলে চারটেয় রেডি থাকবে, ট্রায়াল লাগবে না। লোকে দু দিনের জন্য এসেও কোট-প্যান্ট করিয়ে নিয়ে যায় কাঠমাণ্ডু থেকে, আর তার ফিটিংও হয় নাকি দিব্যি ভাল।

হোটেলে ফিরে এসে দেখি, ফেলুদা তার খাটে বসে নোটবুকটা খুলে কী যেন লিখছে। বলল, বোস। ডাক্তারকে কল দিয়েছি।

ডাক্তার? ডাক্তার আবার কেন? শরীর-টরীর খারাপ হল নাকি ফেলুদার?

আমরা দুজনে সোফায় বসে ফেলুদার দিকে চেয়ে রইলাম রহস্য উদঘাটনের অপেক্ষায়।

ফেলুদা আরও দু মিনিট সময় নিল। তারপর খাতাটাকে পাশে সরিয়ে রেখে একটা চারমিনার ধরিয়ে বলল, হরিনাথ চক্রবর্তী মশাইয়ের ছেলেকে যে ইনজেকশন দিয়েছিল, সেই ডাঃ দিবাকরকে একটা কল দিয়েছি। ধর্ম পথে স্টার ডিসপেনসারিতে বসেন। তাঁর সঙ্গে একবার কথা বলা দরকার। কিছু পয়সা খসবে, ভিজিট নেবে, তা সে আর কী করা যায়!

আমাদের এই তদন্তে ওষুধপত্রের একটা বড় ভূমিকা আছে বলে মনে হচ্ছে! লালমোহনবাবু মন্তব্য করলেন।

ফেলুদা তার কথাগুলোর ওপর বেশ জোর দিয়ে বলল, শুধু ভূমিকা নয়, আমার ধারণা প্রধান ভূমিকা।

সেই যে সার্জিকাল আসিডের কথা অনীকেন্দ্র সোমের নোটবুকে লেখা ছিল, সেটা কি–

সার্জিক্যাল নয়, লাইসার্জিক অ্যাসিড। এল এস ডি। অবিশ্যি—

ফেলুদা আবার খাতাটা হাতে তুলে নিয়েছে, তার কপালে ভাঁজ।

এল এস ডি অক্ষরগুলোর আরেকটা মানে হতে পারে। সেটা এই কিছুক্ষণ হল খেয়াল হয়েছে। এল এস ডি—লাইফ সেভিং ড্রাগস, অর্থাৎ যে ড্রাগ বা ওষুধের উপর মানুষের মরণ-বাঁচন নির্ভর করে। যেমন টেট্যানাস-রোধক ইনজেকশন। বা পেনিসিলিন, টেরামাইসিন, স্ট্রেপটামাইসিন, টি বি-র ওষুধ, হার্টের ওষুধ। আমার তো মনে হচ্ছে—

ফেলুদা আবার খাতাটার দিকে দেখল। তারপর বলল—

A-B-র বিষয় জানা দরকার কথাটাও এই সব ওষুধের বিষয়েই বলা হয়েছে। এ বি হচ্ছে অ্যান্টিবায়োটিকস। মিঃ সোম বোধহয়—বোধহয় কেন, নিশ্চয়ই—এই সব ড্রাগ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করতে চাচ্ছিলেন। রিং আপ পি সি এম, ডি ডি সি—পি সি এম তো প্রদোষচন্দ্র মিত্র, আর ডি ডি সি নিঘাঁত আমাদেরই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ডিরেকটোরেট অফ ড্রাগ। কন্ট্রোল। সোম নিশ্চয় কোনও ওষুধ নিয়ে গিয়েছিল সঙ্গে, যেটা সে এই ড্রাগ কন্ট্রোলকে দিয়ে টেস্ট করাতে চেয়েছিল। আশ্চর্য। লোকটা যেরকম মেথডিক্যালি এগোচ্ছিল, তাতে তো মনে হয় ও ইচ্ছে করলে আই আই টি-র প্রোফেসরি ছেড়ে গোয়েন্দাগিরিতে নেমে পড়তে পারত।

আর C P নিয়ে যে ব্যাপারটা ছিল?

ওটা সহজ। সি পি হল ক্যালকাটা পুলিশ। আস্ক সি পি অ্যাবাউট মেথডস অ্যান্ড কেসেস–অর্থাৎ পুলিশকে জিজ্ঞেস করতে হবে কত রকম ভাবে ওষুধ জাল হয়, আর আগে এ রকম জালের কেস কী কী ধরা পড়েছে।

তা হলে তো খাতায় যা লেখা ছিল তার সবাই–

কলিং বেল।

আমি উঠে গিয়ে দরজা খুললাম।

যিনি ঢুকলেন, তাঁকে দেখলে বেশ হাকচাকিয়ে যেতে হয়, কারণ এত ফিটফাট ডাক্তার এর আগে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। বয়স ষাটের মধ্যে, বিলিতি পোশাকটা নিশ্চয়ই কাঠমাণ্ডুর সেরা টেলারের তৈরি, চশমার সোনার ফ্রেমটা বিলিতি, হাতের সোনার ঘড়িটা নিশ্চয়ই পেশেন্টের কাছ থেকে পাওয়া।

ফেলুদা খাটে ছিল বলে ভদ্রলোক অনুমান করে নিলেন সেই রুগী! আমি খাটের পাশে একটা চেয়ার দিয়ে দিলাম! ফেলুদা উঠে দাঁড়িয়েছিল, এখন খাটেই বসল।

কী ব্যাপার?

ভদ্রলোক বাংলা বলবেন আশা করিনি, কারণ দিবাকর পদবিটা হয়তো বাংলা নয়। তারপর মনে হল এখানকার অনেকেই তো কলকাতায় গিয়ে পড়াশুনা করেছে। ইনিও নিঘাত মেডিক্যাল কলেজ থেকে পাশ করা।

এই নিন।

ফেলুদা বালিশের তলা থেকে একটা খাম বার করে ভদ্রলোককে দিল। ডাক্তার কিঞ্চিৎ হতভম্ব।

এটা–

ওটা আপনার ফি; আর এইটে আমার কার্ড।

কার্ড মানে ফেলুদার ভিজিটিং কার্ড, যাতে নামের তলায় ওর পেশাটা লেখা আছে।

ভদ্রলোক কার্ডটার দিকে দেখতে দেখতে চেয়ারে বসলেন।

আমি জানি, আপনার কাছে ব্যাপারটা এখনও পরিষ্কার হচ্ছে না, বলল ফেলুদা, কিন্তু কয়েকটা কথা বললেই আপনি বুঝতে পারবেন।

ডাক্তারের ভাব দেখে বুঝলাম, তিনি সত্যিই এখনও অন্ধকারে রয়েছেন।

ফেলুদা বলল, প্রথমেই বলি দিই, আমি একটা খুনের তদন্ত করছি। খুনটা হয়েছে কলকাতায়, কিন্তু আমার ধারণা খুনি এখানে রয়েছে। আমি সেই ব্যাপারে কিছু তথ্য সংগ্রহ করছি। আমার বিশ্বাস আপনি আমাকে কিছুটা সাহায্য করতে পারেন।

খুন শুনেই ভদ্রলোকের তুরুতে ভাঁজ পড়েছে। বললেন, কে খুন হয়েছে?

সেটা পরে বলছি, বলল ফেলুদা, আগে একটা জিনিস একটু ভেরিফাই করে নিই-হরিনাথ চক্রবর্তীর ছেলেকে তো আপনি অ্যান্টি-টিট্যানাস ইনজেকশন দেন?

হ্যাঁ, আমিই।

ইনজেকশনটা বোধ করি আপনার স্টক থেকেই এসেছিল?

হ্যাঁ। আমার ডিসপেনসারির স্টক।

কিন্তু তাতে কাজ দেয়নি!

তা দেয়নি, কিন্তু তার জন্য আমাকে রেসপনসি-

আপনি ব্যস্ত হবেন না, ডঃ দিবাকর। দায়িত্বের প্রশ্ন এখনও আসছে না। ইনজেকশন দিয়েও লোকে টেট্যানাসে মরেছে এমন ঘটনা নতুন নয়। সাধারণ লোক সেটা মেনেই নেয়। হরিনাথবাবুও তাঁর ছেলের মৃত্যু মেনেই নিয়েছেন; কিন্তু ডাক্তার হয়ে, হিমাদ্রি চক্রবর্তীর মৃত্যুর কী কারণ, সে সম্বন্ধে হয়তো আপনার কোনও মতামত থাকতে পারে।

কারণ একটা নয়, বললেন ডাঃ দিবাকর, প্রথমত সে নিজেই জানত না তার ইনজুরি কখন হয়েছে। তার বন্ধু বলেছে। পনেরো-ষোল ঘণ্টা আগে। সেটা

যদি ষোল না হয়ে ছাব্বিশ হয়, দেন দ্য ইনজেকশন মাইট হ্যাভ বিন টু লেট। দ্বিতীয়ত, সে ছেলে আগে কোনও কালে প্রিভেনটিভ নিয়েছে কি না সেটারও কোনও ঠিক নেই। নেওয়া থাকলে ইনজেকশনে কাজ দেবার সম্ভাবনা থাকে বেশি। ছেলে বলছে মনে নেই, বাবা বলছে নিয়েছে। হরিনাথবাবুর কথা, খুব বেশি নির্ভর করা যায় না! ওঁর স্ত্রী আর ছেলে মারা যাবার পর থেকে আমি দেখেছি ভদ্রলোকের মাঝে মাঝে মেমরি ফেল করে।

ফেলুদা বলল, হিমাদ্রির মৃত্যুর পর ওর বন্ধু কি আপনার ডিসপেনসারি থেকে কোনও ইনজেকশনের অ্যামপুল নেয়?

নিয়েছিল।

অ্যান্টি-টেট্যানাস?

হ্যাঁ।

সেটা আপনি জানলেন। কী করে? সে কি আপনার সঙ্গে দেখা করেছিল?

দেখা করেছিল বললে ঠিক বলা হবে না। সে আমার চেম্বারে ঢুকে এসে আমায় জানিয়ে দিয়ে যায় যে আমিই তার বন্ধুর মৃত্যুর জন্য দায়ী। আর সেটা যে সে খুব নরম ভাবে জানিয়েছিল তা নয়।

এই বন্ধুটিই খুন হয়েছে।

মানে?

হিমাদ্রি চক্রবর্তীর বন্ধু। অনীকেন্দ্র সোম।

ডাঃ দিবাকর অবাক হয়ে চেয়ে আছেন ফেলুদার দিকে। ফেলুদা বলে চলল—

সে আপনার দোকান থেকে ওষুধ নিয়ে কলকাতা গিয়েছিল ল্যাবরেটরিতে টেস্ট করাবে বলে। সম্ভবত সে-কাজটা তার করা হয়ে ওঠেনি। তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে ইনজেকশনে ভেজাল ছিল। সে চেয়েছিল যে আমার সাহায্য নিয়ে এই জাল ওষুধের চারা কারবারটা একবার তলিয়ে দেখবে।

আমার ডিসপেনসারি থেকে কোনও জাল ওষুধ বেরোয়নি, দৃঢ় স্বরে বললেন ডাঃ দিবাকর।

আপনি কি ওষুধ খাঁটি কি না পরীক্ষা করে ইনজেকশন দেন?

ভদ্রলোক রীতিমতো উত্তেজিত হয়ে উঠলেন।

হাউ ইজ দ্যাট পসিবল? এমারজেন্সি কেস, তখন আমি ওষুধ পরীক্ষা করব, না ইনজেকশন দেব?

আপনার ডিসপেনসারির ওষুধ আসে কেথেকে?

হালসেলারদের কাছে থেকে। তাতে ব্যাচ নাম্বার থাকে, এক্সপায়ারি ডেট থাকে—

সে সবই যে জাল করা যায় সেটা আপনি জানেন? ছাপাখানার সঙ্গে বন্দোবস্ত থাকে চোরা কারবারিদের সেটা জানেন? নাম-করা বিলিতি কোম্পানির লেবেল পর্যন্ত ছাপাখানার ব্যাকডোর দিয়ে চলে যায়। এই সব জালিয়াতদের হাতে সেটা আপনি জানেন?

ডাঃ দিবাকরকে দেখে বেশ বুঝতে পারলাম যে তিনি এ কথার যুৎসই উত্তর খুঁজে পাচ্ছেন না।

শুনুন ডাঃ দিবাকর, ফেলুদা এবার একটু নরম সুরে বলল, আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি যে, ঘূণাক্ষরে কেউ ব্যাপারটা জানবে না। আপনি স্টক থেকে একটা অ্যান্টি-টেট্যানাসের অ্যামপুল নিয়ে তার ভেতরের পদার্থটি ল্যাবরেটরিতে টেস্ট করে তার রিপোর্ট আমাকে দিন। সময় বেশি নেই, সেটা বুঝতেই পারছেন।

ডাঃ দিবাকর ধীরে ধীরে উঠে পড়লেন চেয়ার থেকে।কাল একটা জরুরি কেস আছে—দরজার দিকে যেতে যতে বললেন ভদ্রলোক—আক্ল সম্ভব না হলে পরশু জানাব।

আপনাকে অজস্র ধন্যবাদ; এবং আপনাকে এভাবে উত্ত্যক্ত করার জন্য আমি ক্ষমা চাইছি।

আমরা যে একটা সাংঘাতিক গোলমেলে ব্যাপারের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছি সেটা বেশ বুঝতে পারছি। আর, যতই নতুন নতুন ব্যাপার শুনছি, ততই অনীকেন্দ্র সোম লোকটার উপর শ্রদ্ধা বেড়ে যাচ্ছে। এমন একজন লোকের এভাবে খুন হওয়াটা যে ফেলুদা কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারবে না সেটা খুবই স্বাভাবিক; কুকরিটার জন্য দু নম্বর বাটরাকেই খুনি বলে মনে হয়; কিন্তু তা না হয়ে যদি অন্য কেউও হয়, ফেলুদা তাকে শায়েস্তা না করে ছাড়বে না।

ফেলুদা আগেই বলে রেখেছিল যে খাবার পরে একবার ঘুরতে বেরোবে, তবে সেটা কী উদ্দেশ্যে সেটা আন্দাজ করতে পারিনি। দরবার স্কোয়ারের দিকে যাচ্ছি। দেখে মনে একটা সন্দেহ উঁকি দিল, আর সেটা যে ঠিক, সেটা বুঝতে পারলাম যখন পুরনো প্যালেসের সামনে খোলা জায়গাটায় এসে ফেলুদা বলল, এবার বল কোন গলিটায় গিয়েছিলি দুপুরে।

রাক্তিরে দরবার স্কোয়ারের চেহারা একেবারে অন্য রকম। এখান থেকে ওখান থেকে মন্দিরের ঘণ্টা শোনা যাচ্ছে, এরই মধ্যে কোথেকে যেন হিন্দি ফিল্মের গান ভেসে আসছে। টুরিস্টদের ভিড় আর সাইকেল-রিকশার ভিড় কাটিয়ে আমরা গলিটার মুখে গিয়ে পড়লাম। এটার নাম আগে ছিল মারু টাল, বলল ফেলুদা, হিপিরা এর নতুন নাম দিয়েছে পিগ অ্যালি–শুয়ের গলি।

পাই শপগুলোর পাশ দিয়ে আমরা এগিয়ে গেলাম। আমাদের সেই তিব্বতি দোকানটার দিকে।

দোকানটা এখনও খোলা রয়েছে। দু-একজন খদ্দেরও রয়েছে কাউন্টারের এদিকে, আর পিছনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন সকালের সেই মহিলা। সেই পুরুষটা নেই।

ফেলুদা দোকানের বাইরে থেকেই ভেতরটায় একবার চোখ বুলিয়ে নিল। দোতলা বাড়ির এক তলায় দোকানটা। দোতলায় রাস্তার দিকে দুটো পাশাপাশি

জানালা, দুটোই বন্ধ। কাঠের পাল্লাগুলোর একটার ফাটলের মধ্যে দিয়ে ঘরের ভিতর একটা ক্ষীণ আলোর আভাস পাওয়া যাচ্ছে।

দোকানের ডান পাশে একটা সরু চিলতে গলির পরেই একটা তিনতলা হোটেল, নাম হেভেনস গেট লাজ। স্বর্গদ্বার বলতে চোখের সামনে যে দৃশ্যটা ভেসে ওঠে তার সঙ্গে কোনও সাদৃশ্য নেই।

ফেলুদা হোটেলটার ভিতরে গিয়ে ঢুকল, পিছনে আমরা দুজন।

হাউ মার্চ ডু ইউ চার্জ ফর রুমস হিয়ার?

কাউন্টারে একটা রোগামতন লোক বসে একটা ছোট্ট পকেট ক্যালকুলেটরের উপর পেনসিলের ডগা দিয়ে টোকা মেরে মেরে হিসেব করে একটা খাতায় লিখছে। লোকটা নেপালি কি ভারতীয় সেটা বোঝা গেল না। ফেলুদা তাকে প্রশ্নটা করেছে।

সিঙ্গল টেন, ডাবুল ফিফটিন।

কাউন্টারের সামনে খোলা জায়গাটার এক পাশে একটা খালি সোফা, তার উপরে

দেওয়ালে তিনটে পাশাপাশি টুরিস্ট পোস্টার, তিনটাতেই হিমালয়ের কোনও না কোনও বিখ্যাত শৃঙ্গের ছবি।

ঘর খালি আছে? ফেলুদা ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করল।

ক'টা চাই?

একটা সিঙ্গল একটা ডাবল। দোতলার পুবদিকে হলে ভাল হয়। অবিশ্যি নেবার আগে একবার দেখে নেওয়া দরকার।

কাউন্টারের ভদ্রলোক যাকে বলে স্বল্পভাষী। মুখে কিছু না বলে শুধু একটা বেল টিপলেন, তার ফলে একটি নেপালি বেয়ারার আবির্ভাব হল। ভদ্রলোক তার হাতে একটা চাবি দিয়ে আমাদের দিকে একবার শুধু দেখিয়ে দিয়ে আবার হিসেব করতে লেগে গেলেন।

বেয়ারার পিছন পিছন সিঁড়ি উঠে আমরা সোজা চলে গেলাম পূবমুখো একটা প্যাসেজ দিয়ে। ডাইনের শেষ ঘরটা চাবি দিয়ে খুলে দিল বেয়ারা।

ঘরের বর্ণনা দেবার কোনও মানে হয় না, কারণ ফেলুদা যে ঘর ভাড়া করতে আসেনি সেটা খুব ভাল করেই জানি।

যেটা বলা দরকার সেটা এই যে, ঘরটার পুব দেয়ালে একটা জানালা রয়েছে যেটা দিয়ে তিব্বতি দোকানের দোতলার একটা জানালা এক পাশ থেকে দেখা যাচ্ছে।

লালমোহনবাবু যতক্ষণ খাটের গদি-টদি টিপে, বাথরুমের বাতি জ্বলিয়ে ভিতরটা দেখে, টেবিলের দেরাজ খোলা কি না দেখে, আমরা যে সত্যিই ঘর নিতে এসেছি—এমন একটা ধারণা বেয়ারার মনে ঢোকানোর চেষ্টা করছেন, ততক্ষণে আমি আর ফেলুদা যা দেখার দেখে নিলাম।

দোকানে দুপুরে যে তিব্বতি লোকটাকে দেখেছিলাম, সে বসে আছে ওই টিমটিমে বাতি-জ্বালা ঘরটার ভেতর। তার কাঁধ অবধি দেখা যাচ্ছে। তবে বেশ বোঝা যায়। সে কোনও একটা কাজে ব্যস্ত। তাঁর পিছনে কার্ড বার্ডের প্যাকিং কেসের স্তূপ দেখে মনে হল, সে হয় বাক্স থেকে জিনিস বার করছে না হয় বাক্সের মধ্যে পুরছে।

আরেকজন লোক রয়েছে। ঘরের ভেতর, তবে তার শুধু ছায়াটা দেখা যাচ্ছে। সে যে ঘাড় নিচু করে তিব্বতিটার কাজ দেখছে সেটা বোঝা যায়।

হঠাৎ আমার বুকের ভিতরটা কেমন যেন করে উঠল।

ছায়াটা পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বার করেছে।

সিগারেট মুখে গোঁজার পর আরেকটা জিনিস বার করল পকেট চাপড়িয়ে।

লাইটার।

এবার লাইটারটা জ্বালানো হল।

বাঁ হাতে।

৭

তোরা দুজন দেখবার জায়গাগুলোর কিছু আজ সকালেই দেখে নে, পরদিন সকালে ব্রেকফাস্টের সময় বলল ফেলুদা। —আমার আরেকবার থানায় যাওয়া দরকার। ট্রান্সপোর্ট তো সান ট্র্যাভেলস থেকে পেয়ে যাবি। আর কিছু না হাক, স্বয়ম্ভু, পশুপতিনাথ ও পাটনটা ঘুরে আয়। এক'দিনের পক্ষে এই তিনটেই যথেষ্ট।

রেস্টোর‍্যান্ট থেকে বেরিয়ে সামনেই দেখি মিঃ বাটরা। একেই বলে টেলিপ্যাথি।

ভদ্রলোক হাসিমুখে তিনজনকেই গুড মর্নিং জানালেন বটে, কিন্তু সে হাসি টিকল না।

দ্যাট ম্যান ইজ ব্যাক হিয়ার, গভীরভাবে বললেন মিঃ বাটরা।কাল বিকেলে নিউ রোডেরই এক জুয়েলারি শপ থেকে ওকে বেরোতে দেখেছে আমাদের আপিসের এক ছোকরা।

সে ছোকরা কি ভেবেছিল আপনি হঠাৎ পোখরা থেকে ফিরে এসেছেন? বাটরা একটু হেসে বললেন সেখানে একটা সুবিধে আছে। আমার যমজ ভাইটি একটু উগ্র রং-এর জামাকাপড় পছন্দ করে। কাল পরেছিল একটা শকিং পিংক পুলোভার আর একটা সবুজ শার্ট। আমাকে যারা চেনে তারা কখনও ওকে দেখে আমি বলে ভুল করবে: না। যাই হাক, আমি আজ শুনেই পুলিশে জানিয়েছি ব্যাপারটা। এক সাব-ইনস্পেকটর আছে, তাকে আমি ভাল করে চিনি।

তিনি কী বললেন?

যা বলল তাতে আমি অনেকটা নিশ্চিন্ত বোধ করছি। বলল পুলিশ এ লোক সম্বন্ধে জানে। ওদের সন্দেহ লোকটা কোনও স্মাগলিং র‍্যাকেটের সঙ্গে জড়িত। তবে, কোনও পাওয়ারফুল, ধনী লোক ওর পিছনে থাকায় পুলিশ ওকে বাগে আনতে পারছে না। তা ছাড়া লোকটা অত্যন্ত ধূর্ত। যতক্ষণ পর্যন্ত না একটা বেচাল চালছে, ততক্ষণ পুলিশের ওত পেতে থাকা ছাড়া আর কিছু করার নেই।

কিন্তু আপনার নিজের যে অসুবিধে হচ্ছে সেটা বললেন না? কুকীরিটা কিন্তু সে আপনার নামেই কিনেছিল।

বাটরা বললেন, আপনার কথাটা মনে করেই ওদের জিজ্ঞেস করলাম যে লোকটা তার ক্রাইমের বোঝা আমার ঘাড়ে চাপাতে পারে কি না। তাতে ওই সাব-ইনস্পেকটর হেসেই ফেলল। বলল, মিঃ বাটরা, ডোন্ট থিংক দ্য নেপাল পোলিস আর সে স্টুপিড।

যাক, তা হলে আপনি এখন খানিকটা হালকা বলুন।

মাচ রিলিভ্‌ড, মিঃ বাটরা। আমি বলি কী, আপনারাও একটু রিল্যাক্স করুন। প্রথম বার কাঠমাণ্ডুতে এসে স্রেফ একটা ক্রিমিন্যালের পিছনে ঘুরে বেড়াবেন, সেটা কি ভাল হবে? আপনি একটা দিন ফ্রি রাখুন। এই জন্যে বলছি কী, আমাদের কোম্পানি একটা নতুন ফরেস্ট বাংলো করেছে রাপ্তি ভ্যালিতে, ইন দ্য তেরাইজ! এ রিয়েলি ওয়ান্ডারফুল স্পট। আপনি বিকেলে বলবেন, আমি পরদিন সকালে আপনার ট্রানসপার্ট অ্যারেঞ্জ করে দেব। চাই কী, আমি ফ্রি থাকলে আপনাদের সঙ্গে চলেই আসব। কী বলেন?

তেরাই শুনেই আমরা মনটা নেচে উঠেছে। লালমোহনবাবুর চোখ চকচক। তবু ভাল যে ফেলুদা কথা না দিলেও ব্যাপারটা বাতিল করে দিল না।

আপনি শূকর-সরণির ঘটনাটা চেপে গেলেন কেন? ভদ্রলোক চলে যাবার পর জটায়ু প্রশ্ন করলেন।

তার কারণ, বলল ফেলুদা, তদন্তের সর্ব কথা সব্বাইয়ের কাছে ফাঁস করে দেওয়াটা আপনার গোয়েন্দা-হিরো প্রখর রুদ্রের অভ্যাস হলেও, প্রদোষ মিত্রের নয়; বিশেষ করে যে ব্যক্তির সঙ্গে সর্বসাকুল্যে আড়াই ঘণ্টার আলাপ, তার কাছে তো নয়ই।

বুঝলাম, বললেন জটায়ু। জানলাম; শিখলাম।

সকালের আর একটা ঘটনা হল-যে-বাঙালি ভদ্রলোকটির সঙ্গে কাল এসেই আলাপ হল, যাঁর নাম আজ জানলাম বিপুল ভৌমিক-তাঁর সঙ্গে দেখা হল মিঃ বাটরাকে বিদায় দিয়ে দোতলায় ওঠার সময়।

এটা কী চিনতে পারছেন? ভনিত না করেই হাতের একটা বোতল ফেলুদার দিকে তুলে ধরে প্রশ্নটা করলেন ভদ্রলোক। বোতল আমার চেনা, বিশেষ করে তার ভিতরের লাল রঙের ওষুধটার জন্য। কাশির ওষুধ, আমাদের বাড়িতে সব সময়ই থাকে। বেন্যাড্রিল একস্‌পেকটোর‍্যান্ট।

চিনতে তো পারছি, বলল ফেলুদা, কিন্তু রংটা তো—

আপনি রঙে তফাত পাচ্ছেন? সেটা বোধহয় আপনাদের বিশেষ ক্ষমতা। আমি পাচ্ছি গন্ধে।

ভদ্রলোক ক্যাপ খুলে বোতলটা ফেলুদার নাকের সামনে ধরলেন।

আপনার ঘ্রাণশক্তি তো খুবই প্রখর, বেশ তারিফের সঙ্গে বলল ফেলুদা। —তফাত আছে, তবে খুবই সূক্ষ্ম।

অন্তত একটি ইন্দ্রিয় তো জোরদার হওয়া চাই, বললেন বিপুলবাবু, আপনি চারমিনার খেয়েছেন না একটু আগে? আমি দেখিনি খেতে, কিন্তু গন্ধ পাচ্ছি। কেমন, ঠিক তো?

ঠিক তো বটেই। কিন্তু আপনি বোতল নিয়ে চললেন কোথায়?

ফেরত দোব। পয়সা ফেরত নোব, বললেন বিপুলবাবু, ছাড়ব না। একি ইয়ার্কি পেয়েছে?

কোন দোকান?

আইডিয়াল মেডিক্যাল স্টোর্স ইন্দ্র চক। আপনাকে বললাম না সেদিন, ওষুধ নিয়ে যাচ্ছেতাই কারবার হচ্ছে? মিস্ক পাউডারে খড়ি মিশিয়ে দেয়, জানেন? শিশুদের পর্যন্ত বাঁচতে দেবে না এরা।

মিঃ বাটরাকে গাড়ির কথা বলে দিয়েছিলাম, সাড়ে নটায় একটা জাপানি টয়োটা এসে হাজির। আমরা যখন বেরোচ্ছি তখন ফেলুদা টেলিফোন ডিরেকটরি নিয়ে পড়েছে। বলল এ অঞ্চলের ওষুধের দোকানগুলোর নাম নোট করে নিচ্ছে।

একই শহরে স্বয়ম্ভুনাথের মতো বৌদ্ধস্তূপ আর পশুপতিনাথের মতো হিন্দু মন্দির—এ এক কাঠমাণ্ডুতেই সম্ভব। পশুপতিতে তপেশ, তুমি দৃশ্য দেখো বলে আমাকে ফেলে রেখে মন্দিরে ঢুকে পূজো দিয়ে ফোঁড়া-টোটা কেটে এলেন লালমোহনবাবু। মন্দিরটা কাঠের তৈরি, দরজাগুলো রূপের আর চুড়োটা সোনা দিয়ে বাঁধানো। গেট দিয়ে ঢুকে প্রথমেই যেটা সামনে পড়ে সেটা হল পাথরের বেদিতে বসানো সোনায় মোড়া বিশাল নন্দীর মূর্তি। চাতাল দিয়ে এগিয়ে গেলে দেখা যায় নীচ দিয়ে বাগামতী নদী বয়ে যাচ্ছে, সেখানেই শ্মশান। নদীর ওপারে পাহাড়।

স্বয়ম্ভুতে যেতে হলে গাড়ি প্যাঁচালো পাহাড়ি পথ দিয়ে উপরে উঠে একটা জায়গায় এসে থেমে যায়। বাকি পথ সিঁড়ি দিয়ে উঠতে হয়।

আমরা গাড়ি থেকে নেমে দেখি সিঁড়ির মুখ অবধি রাস্তার ধারে তিব্বতি জিনিস বিক্রি হচ্ছে। লালমোহনবাবুর হঠাৎ শাখ হয়েছে একটা জপ যন্ত্র কিনবেন। জিনিসটা আর কিছুই না—একটা লাঠির মাথায় একটা কৌটো, তার পাশ থেকে ঝুলছে একটা চেনের ডগায় একটা বলের মতো জিনিস। লাঠিটা হাতে নিয়ে ঘোরালে মাথার বল সমেত কৌটোটা ঘুরতে থাকে। ভদ্রলোক আমাকে বুঝিয়ে বললেন, লিখতে লিখতে যখন আইডিয়ার অভাবে থেমে যাই,

বুঝলে তপেশ, তখন অনেক সময় মনে হয়েছে হাতে একটা কিছু নিয়ে ঘোরাতে পারলে হয়তো মাথাটা খুলে যেত। দেখে মনে হচ্ছে জপযন্ত্র ইজ আইডিয়াল ফর দ্যাট।

চার রকমের হয়। জিনিসটা—কাঠের, তামার, রূপের আর হাতির দাঁতের। কাঠের হলেই চলত, কিন্তু এখানে টুরিস্টদের জন্য সব জিনিসের দাম চড়িয়ে রেখেছে। এরা; কাঠও সত্তর টাকার কমে হবে না। শুনে ভদ্রলোক আর এগোলেন না।

দু হাজার বছর আগে পাহাড়ের চুড়োয় বসানা বৌদ্ধস্তূপ স্বয়ম্ভুনাথে যে জিনিসটা সবচেয়ে বেশি মনে থাকে সেটা হল স্তূপের চূড়োর ঠিক নীচে চারকোনা স্তম্ভের চারদিকে আঁকা ঢেউ খেলানো ভুরুওয়ালা জোড়া জোড়া চোখ–যে চোখ মনে হয়। সেই আদ্যিকাল থেকেই সারা কাঠমাণ্ডু উপত্যকার উপর সজাগ দৃষ্টি রেখে আসছে, কোথায় কী ঘটেছে সব জানে, কিন্তু কোনওদিন বলবে না।

স্তূপটা যে সমতল চাতালের উপর দাঁড়িয়ে আছে, সেটা যেমন গিজগিজ করছে দেখবার জিনিসে, তেমনই করছে মানুষ আর বাঁদরের ভিড়ে। লালমোহনবাবু একবার কোমরে একটা খোঁচা খেয়ে বললেন, বাঁদরের খোঁচা, কিন্তু সেটা যে আসলে তা নয়। সেটা পরে জেনেছিলাম। সেটার কথা, যাকে বলে, যথাস্থানে বলব।

আসল ঘটনা ঘটল পাটনে।

পাটন শহর, যার প্রাচীন নাম ললিতপুর, হল বাগামতীর ওপারে, কাঠমাণ্ডু থেকে মাত্র তিন মাইল। শহরে ঢোকবার মুখে একটা পোল্লায় তোরণ, সেটা পেরিয়ে একটা দোকানের সামনে গাড়ি থামিয়ে আমেরিকান কোকা-কোলা খেয়ে তেষ্টা মিটিয়ে আমরা এখানকার দরবার স্কোয়ারে গিয়ে হাজির হলাম।

ফেলুদা এবার আমাকে সাবধান করে দিয়েছিল—আমাদের কাঠমাণ্ডু অ্যাডভেঞ্চার সম্বন্ধে যখন লিখবি, তখন খেয়াল রাখিস যে ফেলু মিত্তিরের গোয়েন্দা কাহিনী যেন নেপালের টুরিস্ট গাইড় না হয়ে পড়ে।

ফেলুদার কথা মনে রেখে শুধু এইটুকুই বলছি যে দেড় হাজার বছর আগে লিচ্ছবি বংশের রাজা বরদেবের পত্তন করা পাটন বা ললিতপুরের মন্দির, স্তূপ, প্রাসাদ, কাঠের কারুকার্য স্বর্ণস্তম্ভের মাথায় রাজার মূর্তি ইত্যাদির এ-বলে-আমায়-দেখ ও-বলে-আমায়-দেখ অবস্থার মধ্যে পড়ে লালমোহনবাবু অবিশ্বাস্য, অভারনীয়, অকল্পনীয়, অতুলনীয়, অননুকরণীয়, অবিস্মরণীয় ইত্যাদি ছাব্বিশ রকম বিশেষণ ব্যবহার করেছিলেন গড়ে তিন মিনিটে একটা করে। আমার বিশ্বাস সেই সময় সেই বিশেষ ঘটনাটা না ঘটলে তিনি আরও মিনিট পনেরো এই ভাবে চালিয়ে যেতে পারতেন।

ঘটনাটা ঘটল দরবার স্কোয়ার পেরিয়ে ডাইনে মোড় নিয়ে একটা বাজারে পড়বার পর। এই বাজার যে মঙ্গল বাজার নামে বিখ্যাত সেটা পরে জেনেছিলাম। এখানে চারদিকে ছোট ছোট দোকানে নেপালি আর তিব্বতি জিনিস বিক্রি হচ্ছে। কাঠমাণ্ডুর চেয়ে দাম কম, আর ভিড় কম বলে দেখার বেশি সুবিধে।

আমরা জিনিস দেখতে দেখতে এগিয়ে চলেছি। লালমোহনবাবুর দৃষ্টি জপ যন্ত্রের দিকে, ফেলুদা বলে দিয়েছে পাটনের কাঠের কাজ পৃথিবী-বিখ্যাত, তাই দাম স্বয়ত্ত্বর চেয়ে অনেক কম হলেও হাই ক্লাস কারুকার্য নয় বলে অনেকগুলোই হাতে নিয়েও বাতিল করে দিচ্ছেন। এমন সময় দেখলাম বাজারের শেষ দিকে একটা মোটামুটি নিরিবিলি অংশে একটা বেশ বড় পুরনো বাড়ির নীচে একটা দোকানের সামনে টেম্পোতে মাল তোলা হচ্ছে।

দোকানের কাছে গিয়ে দেখি লালমোহনবাবু যা চাইছেন সেই জিনিসই বাক্স-বোঝাই হয়ে চালান যাচ্ছে, সম্ভবত কাঠমাণ্ডুর বাজারে।

এইখেনেই বোধহয় তৈরি হচ্ছে জিনিসগুলো, বুঝলে তপেশ। দেখে একেবারে টাটুকা বলে মনে হয়। এটা বোধহয় একটা ফ্যাকটরি।

সেটাও অসম্ভব না। ফেলুদা বলেছিল। পাটনে নাকি অনেক কারিগর এইসব পুরনো কালের জিনিস নতুন করে তৈরি করছে।

সুবিধের দরে পাওয়া যেতে পারে। জিজ্ঞেস করব?

করুন না।

সে গুড়ে বালি। দোকানদার বলল অন্য দোকানে দেখো, আমাদের স্টক ফুরিয়ে গেছে। যা মাল চালান যাচ্ছে সব আড়ারের মাল।

যাচ্চলে, লাক্‌টাই—

লালমোহনবাবুর কথা আটকে গেছে, আর সেই সঙ্গে আমাদের দুজনেরই দৃষ্টি চলে গেছে পাশের গলিটায়।

একটা লোক গলির ডানদিক থেকে বাঁয়ে আসছে। তিব্বতি। একে আমরা চিনি। সেই হলদে টুপি, সেই লাল জোব্বা, সেই একটা চোখ বড়, একটা ছোট।

এ সেই শুয়োর-গলির তিব্বতি দোকানের বেঞ্চিতে বসা আধঘুমো লোকটা। একটা বাড়ি থেকে বেরিয়ে আমরা যে-বাড়িটার সামনে দাঁড়িয়ে আছি, তারই একটা পাশের দরজা দিয়ে ঢুকে গেল।

ঢুকেছে কি? আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে, সেখান থেকে দরজাটা দৃষ্টির বাইরে। সেটা দেখতে পাওয়া যাবে চার পা সামনে গিয়ে বাঁয়ের গলিটায় ঢুকে এগিয়ে গেলে।

আবার সেই ফলো করার রোখ চেপেছে আমাদের দুজনের একসঙ্গে।

লোকটা কোথায় গেল দেখা দরকার।

গোয়েন্দা-গোয়েন্দা ভাবটা যথা সম্ভব চেপে রেখে দুজনে এগিয়ে গেলাম গলিটা দিয়ে। হাত-বিশেক যেতেই বাঁয়ে একটা দরজা পড়ল, যার পাল্লা আর ফ্রেমে কাঠের কাজ দেখলে তাক লেগে যায়।

দরজাটা বন্ধ।

বাড়িটার এদিকের দেওয়ালে এই একটাই দরজা।

এই দরজা দিয়েই ভিতরে ঢুকেছে লোকটা।

আরও দশ পা গিয়ে বাড়িটা শেষ হয়েছে; তার পাশ দিয়ে একটা গলি বাঁয়ে চলে গেছে। একটা ছড়-টানা বাজনার শব্দ আসছে। মনে হল গলিটা থেকেই।

এগিয়ে গেলাম গলিটার মুখ অবধি। এদিকটা একেবারে নির্জন।

গলির ডাইনে, আমাদের থেকে দশ-বারো হাত দূরে, একটা ভিখিরি একটা বাড়ির রোয়াকে বসে সারিন্দা বাজাচ্ছে। লোকটা নেপালি, কারণ সারিন্দা নেপালের যন্ত্র, তিব্বতের নয়। অবিশ্যি এই রকমই যন্ত্র একই নামে পূর্ববঙ্গেও পাওয়া যায়।

যতটা সম্ভব টুরিস্টের ভাব করে এগিয়ে গেলাম গলি ধরে। লোকটার সামনে একটা মরচে-ধরা টিনের কৌটো। যেখানে বসেছে, তার উলটোদিকে একটা দরজা। এটা সেই একই বাড়ির দরজা, যার সামনের দিকে দোকান থেকে জপযন্ত্র চালান যাচ্ছে কাঠমাণ্ডু। এই বাড়িতেই ঢুকেছে শুয়োর-গলির সেই তিব্বতি।

ভিখিরি এক মনে বাজিয়ে চলেছে তার নেপালি গৎ, আমাদের সম্বন্ধে তার কোনও কৌতুহল নেই।

লালমোহনবাবু টিনের কৌটোটায় কয়েকটা খুচরো পয়সা ফেলে দিয়ে চাপা গলায় বললেন, যাবে নাকি ভেতরে?

এ দরজাটা খোলা। এটা সাইজেও ছোট আর এটার বাহারও কম, কারণ এটা হল। ব্যাকডোর, যাকে বলে খিড়কি।

চলুন।

যদি জিজ্ঞেস করে তো কী বলবো?

বলব টুরিস্ট, ভেতরে কী আছে দেখতে এসেছি।

চলো।

ভিখিরিটার দিকে একটা আড়পৃষ্টি দিয়ে, গলিতে আর কোনও লোক নেই দেখে আমরা দুজনে মাথা হেঁট করে দরজাটা দিয়ে ভেতরের প্যাসেজে ঢুকলাম।

প্যাসেজটা পেরিয়ে ডাইনে একটা উঠোনের এক চিলতে দেখা যাচ্ছে। তারও ডাইনে নিশ্চয়ই ঘর আছে। সেই ঘরের দিক থেকেই শব্দটা আসছে।

যান্ত্রিক শব্দ।

না, ঠিক যান্ত্রিক না। যদি বা একটা মেশিন গোছের কিছু চলে, তার সঙ্গে আরও কয়েকটা শব্দ মিশে আছে। মোটামুটি বলা যায় যে শব্দটার মধ্যে একটা তাল আছে।

আমার দম বন্ধ করে পা টিপে টিপে এগিয়ে গেলাম।

বাঁয়ে একটা দরজার পিছনে অন্ধকার ঘর।

একটা পায়ের শব্দ পাচ্ছি। ডানদিক থেকে আসছে সেটা। শব্দটা বাড়ছে।

হঠাৎ খেয়াল হল যে এর মধ্যে কখন জানি সারিন্দার সুর পালটে গেছে! আগেরটা ছিল করুণ, মোলায়েম, এটা নাচনি, হালকা সুর।

এবারে যে লোকটা আসছে তাকে দেখা যাবে।

গলা শুকিয়ে গেছে।

বুঝলাম লোকটা যদি কিছু জিজ্ঞেস করে তো গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোবে না।

আর চিন্তা না করে এক ঝটিকায় লালমোহনবাবুকে টেনে নিয়ে দুজনে ঢুকে পড়লাম বাঁ পাশের অন্ধকার ঘরটায়। রাস্তার দিকের একটা খুপরি জানালা দিয়ে ঘরে সামান্য আলো আসছে, তাতে দেখা যাচ্ছে একটা খাটিয়া, একটা তামার পাত্র, দড়িতে ঝোলানো কিছু জামা-কাপড়।

আমরা দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে শুনলাম পায়ের শব্দটা বাইরে প্যাসেজ দিয়ে রাস্তার দিকে চলে গেল।

সারিন্দা থেমেছে। তার বদলে গলার আওয়াজ পেলাম। লোকটা বাইরে গিয়ে ভিখিরিটার সঙ্গে কথা বলছে।

আমাদের ডাইনে আর একটা দরজার পরে আর একটা ঘর। এটাও অন্ধকার।

জটায়ুর আস্তিন ধরে টেনে নিয়ে সেই ঘরে ঢুকলাম।

কাঠ ও কার্ডবোর্ডের বাক্সে বোঝাই ঘরটা। তা ছাড়া আছে কিছু তামার জিনিস, কিছু মূর্তি, গোটা কুড়ি-পঁচিশ কাঠের ছাঁচ। বাঁয়ে ঘরের কোনায় পড়ে আছে লালমোহনবাবুর শখের জিনিস-তিনটে কাঠের জপযন্ত্র।

আমরা ঢুকেই বাঁয়ে দরজার আড়ালে লুকিয়ে পড়েছি। বেশ বুঝতে পারছি, এ ঘরের বাইরেই বারান্দা পেরিয়ে উঠোন, আর উঠোনের ওদিকের ঘর থেকেই শব্দটা আসছিল।

এখন শব্দ নেই!

এবার একটা নতুন শব্দ।

লোকটা বাইরে থেকে ফিরে এসেছে।

সে খুঁজছে আমাদের।

প্যাসেজ ধরে পায়ের শব্দ এগিয়ে গিয়ে কাউকে না পেয়ে আবার ফিরে এল। যে ঘরে আছি, সে ঘরের ডাইনের দেওয়ালে উঠোনের দিকে পর পর তিনটে দরজা। দরজার বাইরে থেকে আসা আলো তিনবার বাধা পেল সেটা দেখতে পেলাম।

এবারে আমাদের ঠিক পাশের দরজার সামনে এসে পায়ের শব্দটা থামল।

একটা আবছা ছায়া ঢুকে এল ঘরের ভিতরে চৌকাঠ পেরিয়ে।

আমার দম বন্ধ! শরীরের সব শক্তি জড়ো করে তৈরি হচ্ছি। যা করবার আমাকেই করতে হবে।

লোকটা আর দু পা এগোতেই আমাদের দেখতে পেল।

ওর প্রথম হকচকানিটা কাটবার আগেই আমি ডাইভ দিয়ে পড়লাম লোকটার উপর। হাত দুটো সমেত কোমর জাপটে ধরে ঘুরিয়ে দেয়াল-ঠাসা করব।

কিন্তু লোকটা ষণ্ডী। এক ঝটিকায় হাত দুটোকে ছাড়িয়ে নিয়ে আমার কোটের লেপেল দুটো দু হাতের মুঠোয় ধরে এক হাঁচিকায় মাটি থেকে শূন্যে তুলে ফেলল আমায়। বোধহয় ইচ্ছে ছিল ছুড়ে ফেলবে, কিন্তু লালমোহনবাবু সে ব্যাপারে বাগড়া দিচ্ছেন। আমাদের দুজনের মাঝখান দিয়ে হাত গলিয়ে দিয়ে লোকটার হাত দুটোকে আমার কোট থেকে ছাড়াবার চেষ্টা করছেন।

কিন্তু পারলেন না।

লোকটার কনুইয়ের ধাক্কা লালমোহনবাবুকে ছিট্‌কে ফেলে দিল কার্ডবোর্ডের বাক্সের স্তূপের ওপর।

আমার দু হাতের তেলো লোকটার থুতনির তলায় রেখে উপর দিকে চাড় দিয়ে মাথাটাকে চিতিয়ে দিয়েছি, কিন্তু বুঝতে পারছি আমি এখনও শূন্যে, এখনও লোকটা আমাকে ধরে—।

ঠকাং!

হাত দুটো আলগা হয়ে গেল। আমার পায়ের তলায় আবার মাটি। লোকটা দুমড়ে মুচড়ে মাটিতে পড়ল অজ্ঞান হয়ে।

মাথায় বাড়ি।

জপ যন্ত্রের বাড়ি।

পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যে আমরা দুজনে আবার রাস্তায়, জপযন্ত্র লালমোহনবাবুর থলিতে।

৮

কলকাতায় আমাদের বাড়িতে বসে আমি আর ফেলুদা অনেক সময় আমাদের পুরনো অ্যাডভেঞ্চারগুলো সম্বন্ধে আলোচনা করেছি, বিশেষ করে তাদের সম্বন্ধে, যাদের শয়তানি বুদ্ধি ফেলুদাকেও মাঝে মাঝে প্যাচে ফেলে দিয়েছিল। লখনউ-এর বনবিহারী সরকার, কৈলাসের মূর্তি চার, সোনার কেল্লার বর্মন আর মন্দার বোস, মিঃ গোরে, কাশীর মগনলাল মেঘরাজ—এরা সব কোথায়? কী করছে? ভোল পালটে সৎপথে চলছে, না শয়তানির মওকা খুঁজছে? নাকি অলরেডি আরম্ভ করে দিয়েছে শয়তানি?

এসবগুলো এত দিন শুধু প্রশ্নই ছিল; শেষে কাঠমাণ্ডুতে এসে এই পুরনো আলাপীদের একজনের সঙ্গে দেখা হয়ে নেগেটিভ-পজিটিভের ঠোকাঠুকিতে যে বিস্ফোরণের সৃষ্টি হবে, সেটা কে জানত?

পাটন থেকে ফিরে ইন্দিরা রেস্টোরান্টে লাঞ্চ খেয়ে (এদের মেনুতে মোমো ছিল না) প্রায় তিনটে নাগাদ হোটেলে ফিরে দেখি ফেলুদা খাটে শুয়ে সদ্য-কোনা একটা ইংরিজি বই পড়ছে, নাম ব্ল্যাক মার্কেট মেডিসিন। আমাদের দিকে চোখ পড়তেই চোখ কপালে উঠে গেল।

ব্যাপার কী? খুব ধকল গেছে বলে মনে হচ্ছে?

দুজনে ভাগাভাগি করে পাটনের পুরো ঘটনাটা বললাম। জানতাম ফাঁকে ফাঁকে অনেক। প্রশ্ন গুঁজে দেবে ফেলুদা। বেশ বুঝতে পারছি আমরা দুজনে মিলে আজ একটা জবরদস্ত কাজ করে এসেছি। কেন তা ঠিক বলতে পারব না, সমস্ত বাড়িটার মধ্যে যেন জালিয়াতির একটা গন্ধ ছড়িয়ে ছিল। অথচ বাইরে থেকে

দেখলে প্রাচীন পাটনের ইমারতি আর কাঠের কাজের তারিফ করা ছাড়া আর কিছুই করার থাকে না।

সব শুনে-টুনে ফেলুদা সাবাস বলে আমাদের দুজনেরই পিঠ চাপড়ে দিল।

গোয়েন্দাগিরিতে বীরচক্র থাকলে আমি তোদের দুজনেরই নাম রেকমেন্ড করতাম। কিন্তু আপনি যে জিনিসটা দিয়ে বাজিমাত করলেন, সেটা একবার দেখান!

লালমোহনবাবু হালকা মেজাজে থলি থেকে জপযন্ত্রটা তুলে ধরে দেখালেন।

ওর মধ্যে মন্ত্র পোরা আছে কি না সেটা দেখেছেন?

আজ্ঞে।

ওম্ মণি পদ্মে হুম্।

আজ্ঞে?

ওম্-মণি-পদ্মে-হুম্। তিব্বতি মহামন্ত্র। এই মন্ত্রটা একটা কাগজে হাজার বার লিখে অথবা ছেপে প্রত্যেকটা জপ যন্ত্রে পুরে দেবার কথা।

পুরে দেবে? কোথায় পুরে দেবে?

ওই ওপরের জিনিসটা তো একটা কীটো। ওটার মাথাটা তো ঢাকনার মতো খুলে যাবার কথা।

তই বুঝি?

লালমোহনবাবু একটা মোচড় দিতেই মাথাটা খুলে এল।

উঁহু–নো সাইন অফ মন্ত্র।

ভেতরে কিচ্ছু নেই?

লালমোহনবাবু আর একবার ভেতরটা দেখলেন আলোর কাছে এনে।

নাথিং। –না না, দেয়ার ইজ সামথিং। কীসের যেন গুঁড়ো চক্‌চক্ করছে।

কই দেখি!

এবার ফেলুদা ভাল করে দেখল ভেতরটা। তারপর ল্যাম্পের পাশে বেডসাইড টেবিলের উপর উপুড় করে ধরল কৌটোটা।

কাচ। কাচের টুকরো।

একটা বড় টুকরো রয়েছে ফেলুদা?

দেখেছি।

মনে হয় একটা ছোট্ট পাইপ জাতীয় কিছুর অংশ। ফেলুদা মাথা নাড়ল।

পাইপ নয়। অ্যামপুল। অসাবধানে ভেঙে ফেলাতে এই পুরো জিনিসটাকে বাতিল করে দিয়েছে।

তার মানে বলছেন এই জপ যন্ত্রের মধ্যে জাল ওষুধ চালান হত?

কিছুই আশ্চর্য না। জপ যন্ত্রের ভিতর পুরে প্যাকিং কেসে করে জমা হত পিগ অ্যালির তিব্বতি দোকগনের দোতলায়। সেখান থেকে নিশ্চয়ই চলে যেত হালসেলারদের কাছে। তারপর সেখান থেকে দাওয়াখানায়। যে বাক্সগুলো কাল ওই হোটেলেক্স ঘর থেকে দেখেছিলি, আর আজ টেম্পোতে যে বাক্সগুলো তুলছিল—সে কি একই রকম?

আইডেনটিক্যাল, উত্তর দিলেন জটায়ু।

বুঝেছি—ফেলুদার কপালে ত্রিশূলের মতো দাগ—সাপ্লাইয়ের ব্যাপারটা তদ্বির করছে নকল বাটরা। আর ব্যাপারটা যদি বড় স্কেলে হয়, তা হলে হয়তো বেশ কিছু মাল চলে যাচ্ছে সীমানা পেরিয়ে ভারতবর্ষে। বিহার, ইউ পি-র ছোট ছোট শহরে কত লোক এই ভেজাল ওষুধ খায় আর ভেজাল ইনজেকশন ব্যবহার করে তার হিসেব কে রাখছে? ডাক্তারের সন্দেহ হলেও সে যে শোরগোল তুলবে না। সে তো দেখাই গেল। এই যুগটাই যে ওই রকম। চাচা আপন প্রাণ বাঁচা।

ফেলুদা খাট থেকে উঠে কিছুক্ষণ বেশ তেজের সঙ্গে পায়চারি করে নিল। লালমোহনবাবু আবার জপ যন্ত্রে ঢাকনা পরিয়ে সেটা হাতে নিয়ে ঘোরাচ্ছেন।

ফেলুদার অ্যাডভেঞ্চারে অনেক সময়ই তিনি কেবল দর্শকের ভূমিকা পালন করেছেন; আজ তিনি যাকে বলে স্বয়ং রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ।

ঘড়িতে দেখি পৌনে চারটে। আমি লালমোহনবাবুকে মনে করিয়ে দিলাম যে এতক্ষণে তাঁর প্যান্ট রেডি হয়ে থাকার কথা।

এইদ্দ্যাখো। ভুলেই গেস্‌লাম।

ভদ্রলোক এক লাফে সোফা থেকে উঠে পড়লেন। আজি ক্যাসিনো যাচ্ছি। তো আমরা? ট্রাউজারটা কিন্তু সেই উদ্দেশ্যেই করানো।

ফেলুদা পায়চারি থামিয়ে একটা তালি মেরে মন থেকে যেন সমস্ত চিন্তা দূর করে দিয়ে বলল, গুড আইডিয়া। আজকে উই ডিজার্ভ এ হলিডে। ডিনারের পরে এক ঘণ্টা ক্যাসিনোয় যাপন।

অবিশ্যি ক্যাসিনো-পর্ব এক ঘণ্টায় শেষ হয়নি। কেন হয়নি সেটা জানতে হলে আর একটু ধৈর্য ধরতে হবে।

সাড়ে আটটার মধ্যে ডিনার খেয়ে বেরিয়ে পড়লাম। ক্যাসিনো খোলা থাকে নাকি ভোর চারটে অবধি, আর আসল ভিড়টা হয় এগারেটার পর থেকে। এখন গেলে খানিকটা খালি পাওয়া যাবে।

হোটেলটা শহর থেকে খানিকটা বাইরে। বাসে যেতে যেতে বেশ বুঝতে পারছিলাম যে আমরা লোকালয় ছড়িয়ে চলে যাচ্ছি, কারণ রাস্তার আলো ছাড়া আর বিশেষ আলো চোখে পড়ছে না।

মিনিট পনেরো চলার পর খানিকটা চড়াই উঠে একটা গেট পড়ল। তারপর ডাইনে বেশ বড় একটা লন ও সুইমিং পুল পেরিয়ে আবার ডাইনে ঘুরে বাসটা গিয়ে থামল হোটেলের পোর্টিকের ঠিক আগে একেবারে ক্যাসিনোর প্রবেশদ্বারের সামনে। পোল্লায় হোটেলের এক পাশটায় এই ক্যাসিনো। বুঝলাম যারা বাইরে থেকে আসবে তাদের আর আসল হোটেলে ঢুকতেই হবে না।

আমাদের আজকের হিরো-অন্তত এখন পর্যন্ত-হলেন লালমোহনবাবু। বিদেশি ফিল্মে দেখা আদব-কায়দার কোনওটাই বাদ দেবেন না। এমন একটা সংকল্প নিয়েই যেন তিনি ক্যাসিনোতে এসেছেন। অবিশ্যি এসব আদব-কায়দা যে তিনি সব সময় ঠিকভাবে প্রয়োগ করতে পেরেছিলেন তা নয়। যেমন, সুইং ডোর দিয়ে ঢুকেই বাঁয়ে কাউন্টারের পিছনে যে দুটি বো-টাই পরা ভদ্রলোক বসে ছিলেন-যাদের কাছে হোটেল থেকে পাওয়া পাঁচ ডলারের কার্ডটা দেখিয়ে তবে ক্যাসিনোয় ঢুকতে হয়–তাদের দিকে চেয়ে রীতিমতো গলা তুলে হেলালো বলাটা ঠিক বিলিতি কেতার মধ্যে বোধহয় পড়ে না। তবে এটা স্বীকার করতেই হবে যে কাঠমাণ্ডুর টেলার ভদ্রলোকের প্যান্ট বেশ ভালই বানিয়েছে। তার সঙ্গে নিউ মার্কেটে কেনা হালকা সবুজ জার্কিন আর মাথায় নেপালি ক্যাপ—সব মিলিয়ে ভদ্রলোকের মধ্যে বেশ একটা স্মার্টনেসের ভাব এসেছে সেটা স্বীকার করতেই হবে।

কয়েক ধাপ সিঁড়ি নেমে গিয়ে তবে আসল ক্যাসিনো। এক জাপানি ভদ্রমহিলা। উঠছিলেন। সিঁড়ি দিয়ে হ্যান্ডব্যাগ খুলে টাকা ভরতে ভরতে, আর লালমোহনবাবুর দৃষ্টি হাতের কার্ডের দিকে; ফলে দুজনের মধ্যে একটা কোলিশন লাগত। যদি না আমি ভদ্রলোকের জার্কিনের আস্তিনটা ধরে ঠিক সময়ে একটা টান দিতাম। লালমোহনবাবু মহিলার দিকে চেয়ে যেভাবে হোসে হেহেকসখিউজ মিহিহি। বললেন, সেটার দামও লাখ টাকা।

অবিশ্যি যতই কনফিডেনস্-এর ভাব করুন না কেন, খোদ ক্যাসিনায় ঢুকে চারিদিকের ব্যাপার-স্যাপার দেখে ভদ্রলোককে ফেলুদার শরণাপন্ন হতেই হল। ফেলুদাও তৈরি ছিল ওঁকে উদ্ধার করার জন্য।

হাতের কার্ডটায় দেখুন। পাঁচ রকম খেলার জন্য পাঁচটা কুপন রয়েছে। আপনার দ্বারা জ্যাকপট ছাড়া আর কিছু খেলা চলবে না; অন্যগুলোর তল পাবেন না। আপনি জ্যাকপটের কুপানটি ছিঁড়ে ওই কাউন্টারে দিন। ওটা হল ক্যাসিনোর

ব্যাঙ্ক। আপনাকে এক ডলারের হিসেবে যত টাকা হয় দিয়ে দেবে। বোধহয় এগারো টাকার মতো হবে।–নেপালি টাকা। তাতে আপনি এগারোটা চান্স পাবেন জ্যাকপটে। তাতে যদি কিছু মূলধন হয়, তা হলে আরও খেলতে পারবেন। যদি টাকাগুলো যায়, তবে আরও খেলতে হলে ট্যাক থেকে দিতে হবে। কখন থামবেন সেটা সম্পূর্ণ আপনার মর্জি। বেশি হারলে কী হয় তার একটা বড় নজির তো রয়েইছে—যুধিষ্ঠির।

একটা বড় হলঘর আর তার ডানদিকে একটা মাঝারি ঘর মিলিয়ে ক্যাসিনো। বড়টায় পনটুন, ব্ল্যাকজ্যাক, ফ্লাশ আর আসল খেলা রুলেট ছাড়াও কিছু জ্যাকপটের মেশিন রয়েছে, আর ছোটটায় রয়েছে কিনো আর জ্যাকপট। ফেলুদা দেখলাম রুলেটের দিকে এগিয়ে গেল : আমরা গিয়ে ঢুকলাম ডাইনের ঘরে। আমরা দুজনেই কুপন ভাঙিয়ে টাকা নিয়ে নিয়েছি।

তিনদিকের দেয়ালের সামনে পর পর দাঁড়িয়ে আছে বারো-চৌদ্দটা জ্যাকপট মেশিন।

ব্যাপারটা খুব সোজা, একটা মেশিনের সামনে নিয়ে গিয়ে বললাম। লালমোহনবাবুকে, এই দেখুন ব্লট। ওয়েইং মেশিনের মতো করে এর মধ্যে টাকা গুঁজে দেবেন। তারপর এই ডাইনের হাতল ধরে টান। তারপর যা হবার আপনিই হবে।

মানে।

জিত হলে মেশিন থেকে টাকা বেরিয়ে এই পাত্রটায় পড়বে, যেমন ওজনে কার্ড পড়ে। হার হলে কিছুই বেরুবে না।

হুঁ...

আপনি একবার ফেলে দেখুন।

দেখাব?

হ্যাঁ। গুঁজুন টাকা।

গুঁজলাম।

একটা ঘড়ঘড় শব্দের পর বোঝা গেল টাকাটা একটা জায়গায় গিয়ে পড়ল, আর সঙ্গে সঙ্গে মেশিনের গায়ে এক লাইন লেখা জ্বলে উঠিল—কয়েন অ্যাক্সেপটেড।

এবার হাতল টানুন। জোরে।

লালমোহনবাবু মারলেন টান।

মেশিনের সামনে একটা চৌকো কাচের জানালার পিছনে পাশাপাশি তিনটে তিন-রকম ছবি ছিল—হলদে ফল, লাল ফল, ঘণ্টা। হাতলে টান দিতেই মেশিনের ভিতর থেকে একটা ঘড়ঘড় করে ঘোরার শব্দ শুরু হলে আর চোখের সামনে কাচের পিছনের ছবিগুলো বদলাতে বদলাতে সেকেন্ড পাঁচেক পরে ঘট ঘট ঘট শব্দে একটা নতুন কম্বিনেশনে এসে দাঁড়াল। হলদে ফল, হলদে ফল, নীল ফুল।

আর তার পরমুহূর্তেই ঝনাৎ ঝনাৎ করে দুটো টাকা এসে পড়ল পাত্রের মধ্যে।

জিতলুম নাকি? চোখ গোল গোল করে জিজ্ঞেস করলেন লালমোহনবাবু!

জিতলেন বইকী। একে দুই। সে-রকম ভাগ্য হলে একে একশোও হতে পারে। এই দেখুন চার্ট। কোন কম্বিনেশনে কত লাভ হবে এটা দেখালেই বুঝতে পারবেন। ঠিক হ্যায়?

ঔক্কে!

আমি দুটো মেশিন পরে আমার মেশিনে চলে গেলাম। আরও সাত-আটটা মেশিনের সামনে দেশি-বিদেশি মেয়ে-পুরুষ দাঁড়িয়ে খেলে যাচ্ছে। ঘরের এক পাশে কাউন্টারে একজন লোক বসে আছে, তার কাছে চাইলেই একটা প্লাসটিকের বাটি পাওয়া যায় টাকা রাখার জন্য। আমি দুটো চেয়ে নিয়ে একটা লালমোহনবাবুকে দিয়ে এলাম।

এমন জমাটি ব্যাপার যে, খেলার সময় অন্য কোনও দিকে চাওয়া যায় না, অন্য কিছু ভাবা যায় না, মনে হয় বেঁচে থাকার একমাত্র উদ্দেশ্য হল এই জ্যাকপট। তাও একবার বাঁদিকে আড়চোখে চেয়ে দেখলাম লালমোহনবাবু বাটিতে করে বেশ কিছু টাকা কাউন্টারে নিয়ে গিয়ে সেগুলোর বদলে নোট নিয়ে এলেন।

আমারও জিতই হচ্ছিল, রোখও চেপে গিয়েছিল, এমন সময় ফেলুদা পাশের ঘর থেকে এসে হাজির, সঙ্গে একজন বছর পঁচিশেকের মহিলা।

আপাতত কিছুক্ষণের বিরতি, বলল ফেলুদা।

হোয়াই স্যার?

বুঝলাম লালমোহনবাবুর মোটেই ভাল লাগল না ফেলুদার প্রস্তাবটা।

চারশো তেত্রিশ থেকে ডাক এসেছে।

মানে?

ভদ্রমহিলাই বুঝিয়ে দিলেন পরিষ্কার বাংলায়।

ফোর থার্টিথ্রিতে আপনাদের একজন বন্ধু রয়েছেন। তিনি বিশেষ করে অনুরোধ করেছেন একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করতে।

হুইজ দিস ফ্রেন্ড?

লালমোহনবাবু এখনও পুরো ক্যাসিনোর মেজাজে রয়েছেন।

নাম বললেন না, তবে বললেন আপনারা তিনজনেই খুব ভাল করে চেনেন?

চলুন চট্ট করে দেখাটা সেরে আসি, বলল ফেলুদা, কৌতূহলও হচ্ছে, তা ছাড়া মিনিট দশোকের বেশি থাকার তো কোনও প্রয়োজন নেই।

অগত্যা খেলা থামিয়ে রওনা দিলাম। এই অজানা বন্ধুর উদ্দেশে। ভদ্রমহিলা লিফটের মুখ অবধি এসে নমস্কার করে চলে গেলেন।

চার তলায় লিফট থেকে বেরিয়ে বাঁয়ে কাপেট মোড়া প্যাসেজ ধরে একেবারে শেষ প্রান্তে গিয়ে ডানদিকে ৪৩৩ নম্বর ঘর। ফেলুদাই বেল টিপল।

কাম ইন।

দরজাটা লক করা ছিল না; ঠেলাতেই খুলে গেল। ফেলুদাকে সামনে নিয়ে ঢুকলাম আমরা।

বিশাল বৈঠকখানায় একটা মাত্র ল্যাম্প জ্বলছে; ঘরের এক প্রান্তে একটা সোফায় যিনি বসে আছেন, তার ঠিক পিছনেই ল্যাম্পটা জুলছে বলে ভদ্রলোকের মুখ ভাল করে বোঝা যাচ্ছে না। বাইরে থেকে মনে হয়েছিল। ঘরে আরও লোক, কারণ কথাবার্তা শুনতে পাচ্ছিলাম। এখন দেখলাম ভদ্রলোকের উলটোদিকে একটা টেলিভিশনের পাশে আরেকটা যন্ত্র। রঙিন অ্যামেরিকান ছবি হচ্ছে টিভিতে, দেখে বুঝলাম ভিডিও চলছে। ফিল্মের কথাবাতাই শোনা যাচ্ছিল বাইরে থেকে।

আসুন মিঃ মিত্তর, আসুন আঙ্কল।

আমার মাথাটা ভোঁ ভোঁ করছে, গলা শুকিয়ে গেছে, পেটের ভিতরটা খালি খালি লাগছে।

এ গলা যে আমাদের খুব চেনা! ফেলুদা বলেছিল এর মতো ধুরন্ধর প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে লড়েও আনন্দ। পুণ্যতীর্থ কাশীধামে এর সঙ্গে মোকাবিলা হয়েছিল ফেলুদার।

মগনলাল মেঘরাজ।

যার মাইনে করা নাইফ থ্রোয়ার লালমোহনবাবুকে টার্গেট করে খেলা দেখিয়ে ওঁর আয়ু কমিয়ে দিয়েছিল। অন্তত তিন বছর।

কাঠমাণ্ডুতে কী করছে এই সাংঘাতিক লোকটা?

৯

আসেন! বসেন।

টিভির পাশের যন্ত্রটা থেকে একটা তার চলে গেছে ভদ্রলোকের হাতে, সেটার ডগায় একটা সুইচ। ভদ্রলোক সেটা টিপতেই শব্দ সমেত রঙিন ছবি উবে গেল।

ওয়েল, মিঃ মিটার?

আমরা দুটো সোফায় ভাগ করে বসেছি, আমার পাশে লালমোহনবাবু।

এতক্ষণে ভদ্রলোকের মুখটা খানিকটা স্পষ্ট। বিশেষ বদল হয়নি চেহারায়। ধুতিটা এখনও ছাড়েননি, তবে শেরওয়ানিটায় জাত কাটারের ছাপ রয়েছে, আর বোতামগুলো হিরের হলেও হতে পারে। সবচেয়ে বদল হয়েছে পরিবেশে; বেনারসের গলির বাড়ির গদি, আর ফাইভ-স্টার হোটেলের রয়েল সুইটে আকাশ পাতাল তফাত।

এবার রিয়েল হলিডে তো?

তার কি আর জো আছে, একপেশে হাসি হেসে বলল ফেলুদা। ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভনে, জানেন তো?

এখানে কী ধান ভানবেন আপনি মিঃ মিত্তর?

মগনলালের সামনে রূপের ট্রেতে চায়ের সরঞ্জাম। কাপে শেষ চুমুক দিয়ে সেটা নামিয়ে রেখে পাশের টেবিল থেকে ফোনটা তুলে নিলেন।

টি আর কফি? বেস্ট দার্জিলিং টি পাবেন এই হোটেলে।

চা-ই হোক।

রুম সার্ভিস ডায়াল করে তিনটে চায়ের অর্ডার দিয়ে ফোন রেখে আবার ফেলুদার দিকে চাইলেন মগনলাল।

ইন্ডিয়াতে আপনি হিরো-বিগ ডিটেকটিভ। কাঠমাণ্ডু ইজ ফরেন কান্ট্রি মিঃ মিত্তর। এখানে জান-পেহচান আছে কি আপনার?

এই তো একজন পুরনো আলাপী বেরিয়ে গেল!

মগনলাল হালকা হাসি হাসলেন। দুজনের দৃষ্টি পরস্পরের দিক থেকে সরছে না।

আপনি কি সারপ্রাইজড্ হলেন আমাকে দেখে?

তা একটু হয়েছি বইকী? একটা চারমিনার ধরিয়ে দুটো রিং ছেড়ে জবাব দিল ফেলুদা।আপনি হাজাতের বাইরে দেখে নয়; ওটা আপনার কাছে কিছুই না। অবাক হচ্ছি। আপনার কর্মক্ষেত্র বদলেছে দেখে।

হোয়াই? বনারস হালি প্লেস, কাঠমাণ্ডুভি হালি প্লেস। ওখানে বিশ্বনাথজি, ইখানে পস্পতিনাথজি। একই বেপার, মিঃ মিত্তর। যেখানে ধরম, সেখানেই আমার করম। কী বলেন, আঙ্কল?

হেঁঃ হেঁঃ।

বুঝলাম হাসি ফুটলেও, কথা ফোটার অবস্থা এখনও হয়নি জটায়ুর।

করমের কথা যে বলছেন, সেটা কি ওষুধ সংক্রান্ত কোনও কাজ?

আমার শিরদাঁড়ায় একটা শিহরন খেলে গেল। বাঘের সামনে পড়ে ধরনের বেতোয়াক্কা ব্যবহার একমাত্র ফেলুদার পক্ষেই সম্ভব।

ওসূদ? মগনলাল যেন আকাশ থেকে পড়লেন।হায়ার্ট ওসূদ মিঃ মিত্তর? সূদের কারবার আমার একটা আছে ঠিকই, লেকিন ওসূদক কেয়া মতলব?

তা হলে আপনি এখানে কী করছেন সেটা জানতে পারি কি?

সার্টেনলি! লেকিন ফেয়ার এক্সচেঞ্জ হোনা চাই।

বেশ। আপনি বলুন। আমিও বলব।

আমার বেপার ভেরি সিম্পল মিঃ মিত্তর। আমি আর্টের কারবারি সেটা তো আপনি জানেন, আর নেপালে যে আর্টের ডিপো, সেটাও আপনি নিশ্চয়ই জানেন।

ফেলুদা চুপ। লালমোহনবাবু দ্রুত নিশ্বাস ফেলছেন।

এবার আপনার বেপার বলুন। ফেয়ার এক্সচেঞ্জ।

আপনি সব কথা খুলে বলেছেন বলে মনে হয় না, বলল ফেলুদা, তবে আমার কথা আমি খুলেই বলছি। আমি এসেছি একটা খুনের তদন্ত করতে।

খুন?

খুন।

ইউ মিন দ্য মার্ডার অফ মিঃ সোম?

আমি থ। ফেলুদাও থ কি না বোঝার উপায় নেই। লালমোহনবাবু শীত লাগার ভাব করে দাঁতে দাঁত চাপলেন সেটা লক্ষ করলাম। হোটেলের ভিতরের টেমপারেচারটা এমনিতেই একটু কমের দিকে। ক্যাসিনোতে লোকের ভিড়ের জন্য বলে বোধহয় ঠাণ্ডা লাগেনি।

আপনি ঠিকই ধরেছেন মগনলালজি, বলল ফেলুদা, মিস্টার অনীকেন্দ্র সোম।

চা এল। মগনলালের আদেশে নতুন ট্রে থেকে শুধু তিনটে কাপ-ডিশ আর টি-পট রেখে পুরনোটা থেকে টি-পাট আর মগনলালের ব্যবহার করা পেয়ালাটা তুলে নিয়ে চলে গেল বেয়ারা।

আমার বিশ্বাস, ফেলুদা বলে চলল, সোম ভদ্রলোকটি এখানকার কোনও ব্যক্তির কিছুটা অসুবিধার সৃষ্টি করেছিল। তাই তাকে খতম করে ফেলা হল।

মগনলাল চা ঢালছেন আমাদের জন্য।

ওয়ান? টু?

মগনলালের হাতে চিনির পাত্র। কিউব শুগার।

ওয়ান, আমি বললাম, কারণ প্রশ্নটা আমাকেই করা হয়েছিল।

ওয়ান?

এবার জটায়ুকে প্রশ্ন। আমি জানি জটায়ুর মাথায় এল এস ডি ঘুরছে, আর ঘুরছে সেই লোকটার কথা, যে সিঁড়ি নামছে ভেবে সাত তলার ছাতের কার্নিশ থেকে পা বাড়িয়ে দিয়েছিল।

টু? থ্রি?

নো, নো।

নো শুগার?

নো।

লালমোহনবাবু মিষ্টির ভক্ত, চায়ের দু চামচের কম চিনি হলে চলে না, তাও নো বলছেন।

ই কেমন কথা হল মোহনবাবু? আপনার রসগুল্লা খাওয়া চেহারা, শুগারে নো করছেন কেন?

আমি নিয়েছি বলেই বোধহয় ভদ্রলোক শেষ পর্যন্ত সাহস পেলেন।

ও-কে। ওয়ান।

ফেলুদারও একটা। উঠে গিয়ে যে যার চা নিয়ে এসে আবার বসলাম।

ফেলুদা চায়ের কাপটা পাশের টেবিলে রেখে আগের কথার জের টেনে বলল–আমার বিশ্বাস মিঃ সোম জানতে পেরেছিলেন যে এখানে একটা গর্হিত করবার চলেছে। সে ব্যাপারে তিনি কলকাতা গিয়েছিলেন। একটা উদ্দেশ্য ছিল আমার সঙ্গে দেখা করা। তার আগেই তাকে খুন করা হয়। আপনি যখন খুনের ব্যাপারটা জানেন, তখন স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে আপনি এ ব্যাপারে জড়িত কি না।

মগনলাল ভাসা ভাসা চোখে ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি নিয়ে কিছুক্ষণ ফেলুদার দিকে চেয়ে রইলেন। আমাদের হাতে ধরা পেয়ালা থেকে ভুরিভুর করে

হাই ক্লাস চায়ের গন্ধ বেরোচ্ছে; আমু আল্লাল্লমাহনবাবু এই অবস্থাতেই চুমুক না দিয়ে পারলাম না।

জগদীশ!

মগনলাল হঠাৎ হাঁকটা দেওয়াতে চমকে উঠেছিলাম। বসবার ঘরের দু দিকেই যে আরও ঘর আছে সেটা এসেই বুঝেছিলাম। এবার মগনলালের পিছনের একটা দরজা খুলে একজন লোক এসে আমাদের ঘরে ঢুকলা। সঙ্গে সঙ্গে কিড়িং করে যে শব্দটা হল সেটা লালমোহনবাবুর হাতের পেয়ালা কেঁপে গিয়ে পিরিচের সঙ্গে লাগার শব্দ।

জগদীশ নামে যে ভদ্রলোকটি মগনলালের পিছনে এসে দাঁড়ালেন, তিনি হলেন বাটরা নাম্বার টু। কাছ থেকে দেখে বাটরার সঙ্গে সামান্য তফাতটা বুঝতে পারছি। এনার চোখ একটু কটা, কানের দু পাশের চুলে সামান্য পাক ধরেছে, হয়তো শরীরে মাংসও কিছুটা বেশি। আরেকটা বড় তফাত হল, এর চাহনিতে মিশুকে ভাবটা নেই।

ইনাকে চিনেন? প্রশ্ন করলেন মগনলাল।

আলাপ হয়নি। দেখেছি, বলল ফেলুদা।

তবে শুনে রাখুন। গোয়েন্দা বাহাদুর। ইনাকে হ্যাঁরাস করবেন না। আমি জানি আপনারা ইনার পিছনে লেগেছেন। উয়ো আমি বরদাস্ত করব না। জগদীশ ইজ মাই রাইট হ্যান্ড ম্যান।

যদিও উনি নিজে যা করেন তা বাঁ হাতেই করেন।

বলিহারি ফেলুদা। এখনো নার্ভ স্টেডি, গলার স্বর একটুও কাঁপছে না।

মগনলাল আর কিছু বলার আগে ফেলুদা একটা প্রশ্ন করল।

ওনার চেহারার সঙ্গে প্রায় হুবহু মিলে যায়, এমন একজন লোক কাঠমাণ্ডুতে আছে সেটা আপনি জানেন কি?

মগনলালের মুখ আরও থমথমে হয়ে উঠল।

ইয়েস মিঃ মিত্তর। আই নো দ্যাট। সে লোক যদি আপনার দাস্ত হয় তা হলে হিম টু বি ভেরি কেয়ারফুল। সে যেন বুঝে-সুঝে কাম করে। আপনি তো আজ পস্পতিনাথজির শ্মশান দেখে এসেছেন, মোহনবাবু?

লালমোহনবাবু প্রচণ্ড মনের জোরে মগনলালের কথা যেন শুনতে পাননি এমন ভাব; করে বাকি চা-টা ঢাকা করে খেয়ে পেয়ালাটা ঠং শব্দে পাশের টেবিলে রেখে দিলেন।

মগনলালের দৃষ্টি আবার ফেলুদার দিকে ঘুরল।

বাটরা যদি মনে করে সে তার নিজের গলতি কাম জগদীশের কানন্ধে ডালবে, তবে তাকে বলে দিবেন, মিঃ মিত্তর, কি ওই শ্মশানে তার ডেডবডির সৎকার হবে উইদিন টু ডেজ।

নিশ্চয়ই বলব।

ফেলুদাও তার চা শেষ করে কাপটা হাত থেকে নামিয়ে রাখল।

মগনলালের কথা শেষ হয়নি এখনও।

আরও একটা কথা বলে দিই মিঃ মিত্তর। আপনি দাওয়াইয়ের কথা বলছিলেন। আপনি জানেন আমাদের দেশের মানুষের সবসে বড়া দুষমন কে? অ্যালোপ্যাথ ডাকটরস্! মাইসিন জানেন তো? সিন মানে কী? সিন মানে পাপ! পাকিট ফেঁড়ে পয়সা নেবে, হাথ কেঁড়ে ব্লাড নেবে, পেট ফেড়ে পিঠা ফেড়ে বুক ফোঁড়ে এটা নেবে সেটা নেবে। ওয়ার্স দ্যান এনি স্মাগলিং র‍্যাকেট। পেনিসিলিনসে পাসপতিনাথের চরণামৃত ইজ হাভূড টাইমস বেটার! দেশের লোক যদি অ্যালোপ্যাথি ছেড়ে দুস্‌রা দাওয়াই খাবে তো আখেরে দেশের মঙ্গল হবে—এ আপনি জেনে রাখবেন!

শুনলাম আপনার কথা—ফেলুদা উঠে দাঁড়িয়েছে—কিন্তু আপনি দেখছি নিজে এখনও অ্যালোপ্যাথি ছাড়তে পারেননি। আপনার টেলিফোনের পাশে রাখা ওই শিশিটা নিশ্চয়ই চরণামৃতের শিশি নয়।

শিশিটা এমনভাবে আড়ালে রয়েছে যে প্রায় চোখেই পড়ে না।

কথাটা যে মগনলালের মোটেই পছন্দ হল না সেটা তার মুখের উপর ঝোড়ো ভাবটা নেমে আসা থেকেই বুঝেছি।

আসি, মগনলালজি। চা-টা সত্যিই ভাল ছিল।

মগনলাল তার জায়গা থেকে নড়লেন না।

যখন চারশো তেত্রিশ নম্বর সুইট থেকে বেরোচ্ছি, তখন একটা সুইচের শব্দের সঙ্গে সঙ্গে শুনলাম মার্কিন ছবির সংলাপ আবার শুরু হয়েছে।

১০

মগনলালপর্বের পরেও একই রাত্রে যে আরও কিছু ঘটতে পারে সেটা আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি। অথচ লুম্বিনী হোটেলে ফেরার পর আরও দুটো এমন ঘটনা ঘটল, যার ফলে এই বিশেষ দিনটা আমার জীবনে চিরকালের মতো একটা লাল-তারিখ মাক দিন হয়ে রইল।

হোটেলে ফিরে রিসেপশনের বেঞ্চিতে হরিনাথ চক্রবর্তীকে বসে থাকতে দেখে রীতিমতো অবাক হলাম। এত রাত্রে কী ব্যাপার? বললেন প্রায় এক ঘণ্টা, মানে সাড়ে দশটা থেকে, ভদ্রলোক অপেক্ষা করছেন আমাদের জন্য, বিশেষ দরকার।

আসুন আমাদের ঘরে, বলল ফেলুদা।

ঠাণ্ডা মানুষটার মধ্যে বেশ একটা চাপা উদ্বেগের ভাব লক্ষ করছিলাম।

কী ব্যাপার বলুন তো? ঘরে এসে ভদ্রলোককে সোফায় বসিয়ে প্রশ্ন করল ফেলুদা। ভদ্রলোক একটুক্ষণ সময় নিয়ে যেন তাঁর চিন্তাগুলোকে গুছিয়ে নিলেন। তারপর বললেন, হিমাদ্রি। এইভাবে চলে যাওয়াতে সব যেন কেমন গণ্ডগোল

হয়ে গিয়েছিল। আর সত্যি বলতে কী, এও মনে হচ্ছিল যে, তাকে যখন আর ফিরিয়ে আনা যাবে না, তখন এত কথা বলেই বা লাভ কী?

কীসের কথা বলছেন আপনি?

বছর তিনেক আগে, একটু দম নিয়ে বললেন হরিনাথবাবু, হিমাদ্রি এখানে একটা চারা কারবারের ব্যাপার ধরিয়ে দিয়েছিল। গাঁজা চরস ইত্যাদি গোপনে চালান যাচ্ছিল এখান থেকে। হিমাদ্রি ছিল ভয়ানক রেকলেস অ্যাডভেঞ্চার-প্রিয় ছেলে। নিজের জীবনের কোনও তোয়াক্কা করত না। স্মাগলিং যে হচ্ছে সেটা শোনা যাচ্ছিল, কিন্তু ঘাঁটিটা কোথায় জানা যাচ্ছিল না। আপনাকে আগেই বলেছি যে হিমাদ্রিকে হেলিকপটরে নেপালের উত্তর-দক্ষিণ দুদিকেই যেতে হত। একবার উত্তরে গিয়ে সে নিজেই অনুসন্ধান করে জানতে পারে যে ঘাঁটিটা হচ্ছে হেলাম্বুর কাছে একটা শেরপাদের গ্রামে। সে পুলিশকে খবর দেয়। ফলে দলটা ধরা পড়ে।

ভদ্রলোক একটু থামলেন। ফেলুদা বলল, আপনার কি ধারণা ইদানীং সে এই ধরনের আরেকটা চোরা কারবারের সন্ধান পেয়েছিল?

আমাকে সে কিছু বলেনি? বললেন। হরিনাথবাবু, তবে ও মারা যাবার দিন পাঁচেক আগে থেকে দুই বন্ধুতে উত্তেজিত হয়ে আলোচনা করতে দেখেছি। তার কিছু কিছু কথা আমার কানেও এসেছিল। আমি ওকে বলেছিলাম, তুই এসব গোলমালের মধ্যে আর যাস না। এসব গ্যাঙ বড় সাংঘাতিক হয়; এদের দয়ামায়া বলে কিছু নেই। ও আমার কথায় কান দেয়নি।

ফেলুদা গভীরভাবে মাথা নাড়ল।

ওরা যে নির্মম হয় সেটা তো অনীকেন্দ্র সোমের খুন থেকেই বুঝতে পারছি।

আমার বিশ্বাস হিমু টেট্যানাসে না মরলে ওকেও হয়তো এরাই মেরে ফেলত।

এটা কেন বলছেন?

ভদ্রলোক পকেট থেকে এক টুকরো কাগজ বার করে ফেলুদার হাতে দিলেন। খাতার পাতা থেকে ছেঁড়া কাগজ। তাতে লাল কালি দিয়ে দেবনাগরীতে লেখা এক লাইন কথা।

এটা ছিল হিমুর একটা প্যান্টের পকেটে। ও মারা যাবার পর আমার চাকর পেয়ে আমাকে দেয়।

নেপালি ভাষা বলে মনে হচ্ছে? ফেলুদা বলল।

হ্যাঁ। ওর মোটামুটি বাংলা হচ্ছে—তোমার বাড় বড্ড বেড়েছে।

ফেলুদা কাগজটা ফেরত দিয়ে একটা শুকনো হাসি হেসে বলল, সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, জাল ওষুধের চারা কারবার বন্ধ করতে গিয়ে আপনার পুত্রকে সেই জাল ওষুধের ইনজেকশনেই মরতে হল!

আপনি তা হলে বিশ্বাস করেন যে ইনজেকশনে ভেজাল ছিল?

আমার তো তাই বিশ্বাস। সেটা ঠিক কি না সেটা কাল জানতে পারব বলে আশা করছি।

ডাঃ দিবাকরকে যে ওষুধ টেস্ট করতে বলা হয়েছে সেটা ফেলুদা হরিনাথবাবুকে বলল। ভদ্রলোক উঠে পড়লেন।

জানি না। এসব তথ্য জেনে আপনার কোনও লাভ হল কি না, দরজার দিকে এগিয়ে গিয়ে বললেন হরিনাথ চক্রবর্তী।

আমার মনের কিছু অস্পষ্ট ধারণা খানিকটা স্পষ্ট হল। বলল ফেলুদা।তদন্তের ব্যাপারে সেটা একটা মস্ত লাভ।

হরিনাথবাবু যাবার সঙ্গে সঙ্গে লালমোহনবাবুও গুডনাইট করে চলে গেলেন তাঁর ঘরে।

আমি শুয়ে পড়লাম, যদিও ফেলুদার হাবভাবে মনে হচ্ছে বেড-সাইড ল্যাম্প এখন জ্বলবে কিছুক্ষণ।

আজকের রাতটা কী অদ্ভুত ভাবে গেল, হিমাদ্রিবাবুর চোরা কারবারিদের ধরিয়া দেওয়া, মগনলাল কী সাংঘাতিক লোক, কী বেপরোয়াভাবে ফেলুদাকে শাসিয়ে দিল-এইসব ভাবতে ভাবতে চোখের পাতা দুটো বুজে এসেছে, এমন সময় হঠাৎ দরজার বেলটা বেজে উঠল।

সোয়া বারো। এই সময় আধার কে এল?

উঠে গিয়ে দরজা খুলে দেখি তাজ্জব ব্যাপার।

লালমোহনবাবু। বাঁ হাতে এক টুকরো কাগজ, ডান হাতে জপযন্ত্র। মুখের হাসিটাকে লামা-স্মাইল ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। এরকম অমায়িক, স্নিগ্ধ হাসি আজকের দিনে চট করে কোনও সেয়ানা শহুরে লোকের মুখে দেখা যায় না।

হুম, হুম, হুম!

তিনবার হুম শব্দটা উচ্চারণ করে জপযন্ত্র ঘোরাতে ঘোরাতে ভদ্রলোক ঢুকে এলেন ঘরের ভেতর।

ফেলুদা খাটে উঠে বসেছে। আমি ভদ্রলোকের হাত থেকে কাগজের টুকরোটা নিয়ে নিয়েছি। তাতে লাল কালি দিয়ে ইংরাজিতে লেখা—ইউ হ্যাভ বিন ওয়ার্নড। অর্থাৎ তোমাদের সাবধান করে দেওয়া হচ্ছে। ঠিক এই লাল কালিই দেখেছি। একটু আগে একটা নেপালি ভাষায় লেখা হুমকিতে।

কোথায় ছিল এটা? ফেলুদার হাতে কাগজটা চালান দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম ভদ্রলোককে। লালমোহনবাবু তাঁর জহরকেটের ডান পকেটে দুটো চাপড় মেরে বুঝিয়ে দিলেন। ভদ্রলোক এই কেটটা পরেই বেরিয়েছিলেন সকালে। মনে পড়ল স্বয়ম্ভুনাথে বলেছিলেন বাঁদরে ওঁর পকেট ধরে টান দিয়েছিল।

ও—ম্‌ম্‌ম্‌!

টেনে দম নিয়ে পুরো দমটা ছেড়ে শব্দটা উচ্চারণ করলেন ভদ্রলোক চেয়ারে বসতে বসতে।

ও—ম মণি পদ্মে হুম-হুম-হুমকি।

হুমকি তো বটেই, কিন্তু এ কী দশা লালমোহনবাবুর! অথচ মুখে সেই হাসিটা রয়েই গেছে।

আমি ফেলুদার দিকে চাইলাম; ও ঠোঁট নেড়ে বুঝিয়ে দিল—পাউন্ড-শিলিং-পেন্স।

এল এস ডি।

শুগার কিউব!

মগনলাল নিজের হাতেই চিনি দিয়েছিল আমাদের চায়ে। আমাদের দুজনের যখন কিছুই হচ্ছে না, তখন শুধু লালমোহনবাবুর চায়েই দিয়েছিল ওই বিশেষ একটি কিউব। আঙ্কলকে নিয়ে রসিকতা করাটা দেখছি মগনলাল চরিত্রের একটা বিশেষ দিক। কী শয়তান লোকটা!

ওঁ—ম্‌ম্‌ম্‌ম্মণিপদ্মে হুম্‌কি। আবার বললেন ভদ্রলোক। পরমুহূর্তেই হঠাৎ হাসিটা চলে গিয়ে একটা বিরক্তির ভাব দেখা দিল চাহনিতে। দৃষ্টি ফেলুদার দিকে। ফেলুদা একদৃষ্টি লক্ষ করে যাচ্ছে ভদ্রলোককে।

খুলিটা খুলে ফেলুন! ধমকের সুরে বললেন ভদ্রলোক—বলছে খুলি, অথচ খোলার নামটি নেই। হ্যাঃ!

ফেলুদা চাপা গলায় বলল, স্কাউণ্ডুল। বুঝলাম সেটা মগনলালকে উদ্দেশ করে বলা হচ্ছে।

জপযন্ত্র এখন থেমে আছে। আস্তে আস্তে বিরক্ত ভাবটা চলে গিয়ে, লালমোহনবাবুর চোখ ফেলুদার উপর থেকে সরে গিয়ে চলে গেছে খাটের পাশে জলভরা গেলাসটার দিকে।

চাখের দৃষ্টি ক্রমশ তীক্ষ্ণ থেকে তীক্ষ্ণতর হয়ে এল।

আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে। ঘরে পিন ড্রপ সাইলেন্স। লালমোহনবাবু চেয়ে আছেন গেলাসটার দিকে; মনে হচ্ছে গেলাসটা হয়তো বা ওঁর মন্ত্রের জোরে টেবিল থেকে শূন্যে উঠে পড়বে।

আহাহা! বললেন লালমোহনবাবু। তীক্ষতা চলে গিয়ে একটা ঢুলু ঢুলু ভগব চোখে, সেই সঙ্গে তারিফের হাসি।আহাহা ভিবজিওর। আহে। আহা!—তপেশী, দেখেছি রং?

আমি থতমত খেয়ে কিছু বলার খুঁজে পাচ্ছি না। অথচ লালমোহনবাবু ছাড়বেন না। ভিবজিওর মানে হচ্ছে ভায়োলেট, ইন্ডিগো, বু, গ্রীন, ইয়েলো, অরেঞ্জ, রেড। অর্থাৎ গেলাসের জলে রামধনুর রং দেখছেন তিনি।

তপেশ ভাই, দেখেছি রং? ভিবজিওর ভাইব্রেট করছে, দেখেছ?

কথার মাঝে মাঝে যখন ফাঁক পড়ছে আর লালমোহনবাবু শুধু চুপ করে চেয়ে আছেন সামনের দিকে, সেই সময়টা আমার তন্দ্রার মতো আসছে। আবার কথা শুরু হলেই ঘুমটা ভেঙে যাচ্ছে। একবার তন্দ্রার অবস্থা থেকে মাইস বলে একটা চিৎকারে লাফিয়ে উঠে দেখি লালমোহনবাবু ভীষণ সোজা হয়ে বসে ওঁর সামনে মেঝের দিকে চেয়ে আছেন।

মাইস। আবার বললেন ভদ্রলোক। তারপর বিড়বিড়ানি শুরু হল কিছুক্ষণ—টেরামাইস, টেট্রামাইস, সুবামাইস, ক্লোরোমাইস, কমপ্রোমাইস.কিলবিল করে ঘুরে বেড়াচ্ছে সব!—আমার সঙ্গে ইয়ার্কি?

শেষের কথাটা বেদম জোরে বলে। লালমোহনবাবু হঠাৎ সোফা ছেড়ে উঠে কাপেটে মোড়া মেঝেতে পায়ের গোড়ালি দিয়ে ঘা দিতে শুরু করলেন—যেন প্রত্যেকটা ইঁদুরকে পিষে পিষে মারছেন। —আবার পেখম ধরা হয়েছে! এদিক নেই। ওদিক আছে!

এইভাবে চলল মিনিট তিনেক। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে না—সারা ঘর ঘুরে ঘুরে এই কাণ্ড। আশা করি আমাদের ঠিক নীচের ঘরে কোনও গেস্ট নেই!

ব্যস, খতম।

লালমোহনবাবু বসে পড়লেন।

ঝ্যাক আবার বললেন ভদ্রলোক। —অল টিকটিকিজ খতম।

কোন ফাঁকে যে ইঁদুর টিকটিকি হয়ে গেল সেটা বোঝা গেল না।

খতম! অ্যান্টিবায়োটিকটিকিজ—খতম।

এতটা এনার্জি খরচ করার ফলেই বোধহয় লালমোহনবাবুর মধ্যে এবার একটা ঝিমধরা ভাব এসে গেল। তার সঙ্গে সেই আলাভোলা হাসি।

ওমমম, মোমোমোমোমো—ওমমম!

এর পরে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না। যখন উঠলাম, তখন পুবের জানালা দিয়ে রোদ এসে ঘর একেবারে আলোয় আলো। ফেলুদা চানটান করে দাড়িটাড়ি কমিয়ে রেডি, সবেমাত্র কাকে যেন ফোন করে রিসিভারটা নামিয়ে রাখল।

উঠে পড়ে তোপ্‌সে, কাজ আছে। আজ সকালেই বাটরার সঙ্গে একবার দেখা করা দরকার। তার অবস্থাটা যে খুব নিরাপদ নয় সেটা তাকে জানানো দরকার।

ফোনটা কাকে করলে?

পুলিশ স্টেশন। ভেরি গুড নিউজ। দুই সরকারে সমঝোতা হয়ে গেছে।

এ তো দারুণ খবর!

হ্যাঁ। কিন্তু তার আগে আমি নিজে একটা ফোন করেছিলাম, সেটার খবরটা খুব ভাল না।

কেন? কাকে করেছিলে ফোন?

ডাঃ দিবাকর। উনি নাকি আজ ভোরে একটা জরুরি কল পেয়ে চলে গেছেন, এখনও ফেরেননি। ব্যাপারটা মোটেই ভাল লাগছে না।

কেন ফেলুদা?

মনে হয় উনি আমাদের হয়ে ওষুধ পরীক্ষণ করে দেখছিলেন, সেটা চোরাকারবারি দল পছন্দ করেনি। অবিশ্যি এটা আমার অনুমান; দেখি,

ঘণ্টাখানেক পরে আরেকটা ফোন করে দেখব। তাতেও না হলে ডিসপেনসারিতে চলে যাব।

লালমোহনবাবুর ব্যাপারটা কতক্ষণ চলেছিল সেটা না জিজ্ঞেস করে পারলাম না।

উনি গেছেন ঘণ্টা খানেক হল, বলল ফেলুদা, পরের দিকটা একেবারে মহানিবাণের অবস্থা! কোনও উৎপাত করেননি। আসলে এল এস ডি-র প্রভাব সাত-আট ঘণ্টার কমে যায় না।

তুমি অল অ্যালং জেগে ছিলে?

উপায় কী? কখন কী করে বসে তার তো ঠিক নেই। ভাগ্য ভাল সুভদ্রলোকের কোনও খারাপ এফেক্ট হয়নি।

এখন একদম নরম্যাল?

পুরোপুরি নয়। যাবার সময় বলে গেলেন আমার মগজের নাকি তিন ভাগ স্থল, একভাগ জল। সেটা কমপ্লিমেন্ট হল কি না ঠিক বুঝলাম না। তবে খোশ মেজাজে আছেন। কোনও ডেঞ্জার নেই।

১১

আমি আধা ঘণ্টার মধ্যে তৈরি হয়ে নিলাম। ফেলুদা বলেছিল নীচে থাকবে, যাতে টেলিফোন এলে তৎক্ষণাৎ রিসেপশন থেকেই কথা বলতে পারে। গিয়ে দেখি ও পায়চারি করছে। বলল, এখনও ফেরেনি। ডাঃ দিবাকর। মুশকিল হচ্ছে কী, কোথায় যে গেছেন, সেটাও বাড়ির লোকে জানে না।

অরি বাটরা?

বাটরার লাইনটা পাচ্ছি না। আরও বার-দুয়েক দেখি। না হলে ব্রেকফাস্টের পর সোজা চলে যাব ওর আপিসে। এমনিতেও একটা গাড়ির ব্যবস্থা করতে হবে।

মিনিট তিনেকের মধ্যেই লালমোহনবাবু এসে হাজির। কোনও তাপ-উত্তাপ নেই, যেন অস্বাভাবিক কিছুই ঘটেনি। তবে আমার সঙ্গে যে সামান্য কথাবাতা হল তাতে বুঝলাম যে চিনি এখনও সম্পূর্ণ হজম হয়নি।

রিসেপশনের দেওয়ালে টাঙানো একটা নেপালি মুখোসের নাকের উপর বার তিনেক হাত বুলিয়ে বললেন, ইংলন্ডের রাজপ্রাসাদের নামটা কী যেন ভাই তপেশ?

বার্কিংহাম প্যালেস?

ইয়েস, বললেন লালমোহনবাবু, তবে এর সঙ্গে বোধহয় কমপ্যারিজন হয় না।

কার সঙ্গে?

আমাদের এই হোটেল লুমুম্বা।

লুম্বিনী।

লুম্বিনী।

তারপর একটুক্ষণ চুপ থেকে বললেন, এইখানেই তো জন্মেছিলেন, তাই না?

কে?

গৌতম বুদ্ধ?

এই হোটেলে নয় নিশ্চয়ই।

কেন, বিফোর ক্রাইস্ট হোটেল ছিল না বলছ?

এই অদ্ভুত আলোচনা আর বেশিক্ষণ চলল না, কারণ ফেলুদা এসে বলল যে চটপট ব্রেকফাস্ট সেরে বাটরার আপিস সান ট্র্যাভেলাসে যাওয়া দরকার, ওদের টেলিফোনে পাওয়া যাচ্ছে না।

ফেলুদার দেখাদেখি আমরাও শুধু কফিতে ব্রেকফাস্ট সারলাম। মন বলছে আজ অনেক কিছু ঘটবে, কিন্তু কী ঘটবে সেটা বুঝতে পারছি না।

আমাদের হোটেল থেকে পাঁচ মিনিটের হাঁটা পথ মিঃ বাটরার আপিস। বেশি বড় না। হলেও, বেশ ছিমছাম আপিস, দেখেই বোঝা যায় বয়স বছর-তিনেকের বেশি না। এক দেওয়ালে নেপালের রাজা-রানির ছবি, আর অন্য দেওয়ালে যার ছবি-কুঝলাম সে-ই এই অ্যাপিসের মালিক মিঃ রাণা।

আপিসে এসে যে খবরটা পেলাম সেটাকে একটা বামশেল বললেও বাড়িয়ে বলা হবে।

বাটরার ঘরে গিয়ে দেখি তিনি নেই, রয়েছেন তাঁর সেক্রেটারি মিঃ প্রধান। তাঁর কাছেই জানলাম যে মিঃ বাটরাকে হঠাৎ বেরিয়ে যেতে হয়েছে।

এ ভেরি ইম্পট্যান্ট পারসন আজ সকালে ফোন করলেন। মিঃ বাটরাকে, বললেন মিঃ প্রধান! বললেন তেরাইতে আমাদের নতুন বাংলোটা দেখার খুব ইচ্ছা। তাই মিঃ বাটরাকে ওঁর সঙ্গে চলে যেতে হল। অবিশ্যি উনি ইনস্ট্রাকশন দিয়ে গেছেন যে আপনার গাড়ি লাগলে যেন তার ব্যবস্থা আমরা করে দিই। তার কোনও ডিফিকাল্টি হবে না।

এই ইম্পট্যান্ট পারসনটির নাম জানতে পারি কি? ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

সার্টেনলি। মিঃ মেঘরাজ; ওবেরয় হোটেলে আছেন। ভেরি বিগ আর্ট ডিলার।

লালমোহনবাবু আমার হাতটা খপ করে ধরলেন। বুঝলাম মেঘরাজের নামেই ওর নেশা ছুটে গেছে। সত্যিই, যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধে হয়। মিঃ বাটরা যে এত সহজেই মগনলালের ফাঁদে পড়ে যাবেন সেটা ভাবতে পারিনি।

এখান থেকে আপনাদের বাংলোয় যেতে কতক্ষণ লাগে? ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

আপনাকে যেতে হবে ত্রিভুবন রোড দিয়ে হেতাওরা-১৫০ কিলোমিটার। হেতাওরা ইজ এ টাউন-ওখানে আপনি লাঞ্চ করে নিতে পারেন। কারণ আমাদের বাংলো নতুন, সেখানে কিচেন চালু হয়নি এখনও। টাউন থেকে ডাইনে ঘুরে রাপ্তি নদীর পাশ দিয়ে তিন কিলোমিটার গিয়ে আরও ডাইনে দু ফার্লিং গিয়েই বাংলো। জঙ্গলের মধ্যে-বিউটিফুল স্পট।

ফেলুদা আধঘণ্টা পরে হোটেলে গাড়ি পাঠাতে বলে দিল। ওকে একবার নাকি চট করে দরবার স্কোয়ারের দিকে ঘুরে আসতে হবে। বলল, তোরা হোটেলে ফিরে গিয়ে আমার জন্য অপেক্ষা কর। আমার বিশ-পাঁচিশ মিনিটের বেশি লাগবে না।

গাড়ি এল কুড়ি মিনিটের মধ্যে, আর ফেলুদা পঁচিশে। বলল, ওকে নাকি একবার ফ্রিক স্ট্রিট যেতে হয়েছিল। সেটা আবার কোথায়? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

কাছেই বলল ফেলুদা, বলা যেতে পারে হিপি-পাড়া।

পাঁচ মিনিটের মধ্যে শহর ছাড়িয়ে ত্রিভুবন রোড ধরল। আমাদের ট্যাক্সি। ফেলুদার হাতে খাতা, চোখে ভ্রূকুটি, বাইরের দৃশ্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন। লালমোহনবাবুর নেশা ছুটে গেলেও, একটা আশ্চর্য মোলায়েম ভাব লক্ষ করছি ওঁর মধ্যে যেটা আগে কখনও দেখিনি। মনে হয় যেন এ সব সাময়িক উত্তেজনার অনেক উর্ধ্বে উঠে গেছেন তিনি। জানালা দিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখে শুধু একটা মাত্র মন্তব্য করলেন–

কাল সব ডবল দেখছিলাম, আজ সিঙ্গল।

ফেলুদা কথাটা শুনে খাতা থেকে মুখ তুলে লালমোহনবাবুর দিকে কেমন যেন অন্যমনস্কভাবে চেয়ে থেকে বলল, এটাও যেমন ঠিক, তেমন এর উলটোটাও ঠিক।

কথাটা আমার কাছে ভীষণ রহস্যজনক বলে মনে হল।

কাঠমাণ্ডুর চার হাজার ফুট থেকে আরও অনেক উপরে উঠে এসেছি। তিন পাশ ঘিরে বরফের চূড়ো দেখা যাচ্ছে। আগেই জানতাম যে সাড়ে সাত হাজার ফুট অবধি উঠতে হবে তাই ঝোলাতে করে গরম মাফলার নিয়ে নিয়েছিলাম; ঘণ্টা দেড়েক চলার পর সেগুলোর প্রয়োজন হয়ে পড়ল। সঙ্গে ফ্লাস্কে কফি ছিল, গাড়ি চালু অবস্থাতেই তিনজন খেয়ে নিলাম।

অল্পক্ষণের মধ্যেই নামা শুরু হয়ে গেল। নাড়া মহাভারত পর্বতশ্রেণী ছড়িয়ে আমরা এখন ঘন সবুজে ঢাকা শিবালিক পর্বতশ্রেণীর দিকে চলেছি। অত দূর যেতে হবে না আমাদের, কারণ মাঝপথেই পড়বে রাপ্তি উপত্যকায় নদীর পাশে হেতাওরা শহর। সেইখান থেকে ত্রিভুবন রাজপথ ছেড়ে ডানদিকে ঘুরব আমরা।

তোপ্‌সে—বাটরার পুরো নামটা জনিস?

হাতের খাতটি বন্ধ করে হঠাৎ প্রশ্ন করল ফেলুদা।

আমি বললাম, না তো, উনি তো কোনওদিন বলেননি।

না বললেও তোর জানা উচিত ছিল, বলল ফেলুদা, ওর আপিসের ঘরে ওর টেবিলের উপর একটা প্লাস্টিকের ফলকে লেখা ছিল পুরো নামটা। অনন্তলাল বাটরা।

হেতাওরা যখন পৌঁছলাম। তখন দুটো বেজে গেছে। খিদে পাবার কথা, কিন্তু পায়নি। একেকটা অবস্থায় পড়লে মানুষ খিদে-তেষ্টা ভুলে যায়, এটা সেই অবস্থা। লালমোহনবাবুকে জিজ্ঞেস করাতে বললেন, ফুড ইজ নাথিং।

ড্রাইভার রাস্তা জানে, সে ত্রিভুবন রোড ছেড়ে ডানদিকে ঘুরল। একটা সাইন বোর্ড দেখে বুঝলাম যে, এই রাস্তা দিয়েই ট্রি টপস হোটেলে যায়, যেখানে গাছের মাথায় বসানো হোটেলের বারান্দায় বসে তেরাই-এর বন্য জানোয়ার দেখা যায়। আমাদের বাংলো অবিশ্যি পড়বে তার অনেক আগেই।

বাঁদিক দিয়ে রাপ্তি নদী ছুটে চলেছে পাথর ভেঙে দু দিকের ঘন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে। আমাদের রাস্তারও ডানদিকে ঘন শালবন। মন বার বার বলছে, এই হল সেই তেরাই, সেই গায়ে কাটা দেওয়া অরণ্যভূমি, হিংস্র জানোয়ারের ডেরা হিসেবে যার আর জুড়ি নেই। সিপাহি বিদ্রোহের পর নানাসাহেব তার দলবল নিয়ে ভারতবর্ষ থেকে পালিয়ে এসে এই তেরাইয়েরই এক অংশে গা ঢাকা দিয়ে ছিল।

রাস্তা আবার ডাইনে মোড় নিল। এটা কাঁচা, হালে তৈরি হয়েছে।

এই রাস্তা ধরে মিনিট তিনেক চালেই লাল টালির ছাতওয়ালা কালো কাঠের বাংলোটা চোখে পড়ল! বনের গাছ কেটে বেশ কিছুটা জায়গা সাফ করে কম্পাউন্ডে ঘেরা বাংলোটা তৈরি হয়েছে।

ডাইনে ঘুরে বাংলোর গেট দিয়ে ঢুকে নুড়ি ফেলা পথের উপর দিয়ে শব্দ তুলে আমাদের গাড়ি বাংলোর বারান্দার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। বাঁয়ে কিছুটা দূরে কম্পাউন্ডেরই ভেতর দুটো পাশাপাশি গারাজের সামনে আর একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে।

গাড়ি থামার সঙ্গে সঙ্গে জায়গাটার আশ্চর্য নিস্তব্ধতার একটা আন্দাজ পেয়েছি। বিবির শব্দ ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই। না, সেটা ঠিক না। একটা সামান্য খুঁটিখাট শব্দ কোত্থেকে আসছে সেটা বুঝতে পারছি না।

আমাদের গাড়ির ড্রাইভার অন্য গাড়িটার দিকে চলে গেল, আমরা তিনজন তিন ধাপ সিঁড়ি ভেঙে জাল দেওয়া দরজাটা খুলে বারান্দায় গিয়ে ঢুকলাম।

ভিতরে আসুন মিঃ মিত্তর!

সামনের ঘরটাই বৈঠকখানা, তার ভিতর থেকেই ডাকটা এসেছে। মগনলালের পালিশ করা গভীর গলাটা চিনতে অসুবিধা হয় না।

আমরা তিনজন গিয়ে বৈঠকখানায় ঢুকলাম।

ঘরের তিন দিকে সোফা, মাঝখানে একটা বড় গোল টেবিল, দেওয়ালে বাঁধানো নেপালের দৃশ্য, মেঝেতে তিব্বতি কর্পেট। এ ছাড়া পাশে একটা টেবিলের উপর একটা রেডিয়ো রয়েছে। আর এক কোণে একটা বুক শেলফে কিছু বই আর পত্রিকা।

আমাদের ঠিক সামনের সোফাটায় এক ধারে বসে মগনলাল একটা টিফিন ক্যারিয়ার থেকে পুরি আর তরকারি খাচ্ছে। একজন চাকর পাশে দাঁড়িয়ে আছে জলের জাগ আর গামলা হাতে নিয়ে।

এ ছাড়া আর কোনও তৃতীয় ব্যক্তি নেই।

আমি জানতাম। আপনি আসবেন, খাওয়া শেষ করে ভেজা তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছে বললেন মগনলাল। আমরা তিনজনে ইতিমধ্যে বসে পড়েছি।

আপনি কী ব্যাপারে এসেছেন, সেটা আমি জানি মিঃ মিত্তর। বট দিস টাইম ইট ইজ মাই টার্ন! ঘুঘুতে বার বার খাবে না দানা, খাবে কি?

ফেলুদা নির্বাক।

বেনারসে আপনি যে বেইজিত করলেন আমাকে বললেন মগনলাল, সে তো আমি ভুলিনি মিঃ মিত্তর। বদলা নেবার মওকা যদি আপনি দিয়ে দেন, বদলা আমি নেব না?

একটা ধাপ ধাপ আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি মাঝে মাঝে এই বাংলোরই কোনও অংশ থেকে। মনে হচ্ছে, ডানদিকের কোনও ঘর থেকে আসছে। কীসের শব্দ বোঝা মুশকিল।

মিঃ বাটরা কোথায় সেটা জানতে পারি কি?

মগনলালের হুমকি অগ্রাহ্য করে শান্তভাবে জিজ্ঞেস করল ফেলুদা।

মগনলাল আপসোসের ভঙ্গিতে চুক্ চুক করে শব্দ করে বললেন, ভেরি সাড়, মিঃ মিত্তর। আমি তো কাল বললাম। আপনাকে-জগদীশ আমার রাইট হ্যান্ড ম্যান। রাইট হ্যান্ড তো একটাই থাকে মানুষের-দোনো কি কেয়া জরুরত?

আপনি কিন্তু আমার কথার জবাব দিলেন না। আমি জানতে চাই সে ভদ্রলোক কোথায়?

বাটরা জিন্দা আছে মিঃ মিত্তর, শেরওয়ানির পকেট থেকে পানের ডিবে বার করে দুটো পান মুখে পুরে দিয়ে বললেন মগনলাল—ডে টাইমে হি উইল বি সেফ। তেরাই-এর বেপার তো। আপনি জানেন। গরমিন্ট ল আছে কী এখানে ওয়াইলড লাইফ মারা চলবে না, লেকিন ওয়াইলন্ড লাইফ যদি মানুষ মারে, দেন হায়াট? সেটার এগনেস্টে কোনও ল আছে কি?

আপনি যে এখানে চলে এলেন, কাঠমাণ্ডুতে আজি কী হচ্ছে সেটা আপনি জানেন?

কী হচ্ছে মিঃ মিত্তর?

আপনার পাটনের কারখানা আর কাঠমাণ্ডুর শুয়োর-গলির গুদোম আজ তছনছ হয়ে যাচ্ছে।

মগনলাল সমস্ত দেহ দুলিয়ে অট্টহাসি করে উঠলেন।

আপনি কি ভাবেন আমি এত বুদ্ধ মিঃ মিত্তর? পোলিস উইল ফাইন্ড নাথিং, নাথিং। পাটনে দেখবে হ্যাঁন্ডিক্রাফট তৈয়ার হচ্ছে, আউর শুয়ার-গলিতে দেখবে গুদাম খালি! সব মাল লরিতে করে আমি সঙ্গে নিয়ে এসেছি মিঃ মিত্তর। হেতাওরা দিয়ে লরিতে মাল যায় ইন্ডিয়া। টিম্বার। সেই লরিতে করে সব দাওয়াই চলে যাবে বিহার, ইউ পি। ওষুধের অনেক কাম তো আমার ইন্ডিয়াতেই হয়। লেবেল, ক্যাপসুল, অ্যামপুল, ক্যাপ, ফায়াল, সবই তো ইন্ডিয়া থেকে আসে। বাকি

কাম হয় এখানে, বিকজ এখানের লোক ইন্ডিয়ার লোকের চেয়ে কাম করে বেশি। অ্যান্ড বেটার।

আমার কানটা খুব ভাল বলেই বোধহয় ঝিঁঝির ডাক ছাপিয়ে আরেকটা আওয়াজ শুনতে পেলাম। ফেলুদার ঘাড়টা এক মুহূর্তের জন্য একবার সামান্য বাঁদিকে ঘুরতে বুঝলাম সেও আওয়াজটা পেয়েছে।

জগদীশ।

বুঝলাম মগনলাল কথা শেষ করে কাজে চলে এসেছেন।

ডান পাশের ঘর থেকে ফুলকারি করা পদ ফাঁক করে যিনি আমাদের ঘরে এসে ঢুকলেন, তার বাঁ হাতে ধরা রিভলভারটা সোজা ফেলুদার দিকে তাগ করা রয়েছে।

উঠুন আপনারা তিনজন! মগনলাল হাঁকিয়ে হুকুম দিলেন।

আমরা উঠলাম।

হাত তুলুন মাথার উপরে।

তুললাম।

গঙ্গা! কেসরী?

আরও দুজন লোক—তাদের ঠিক ভদ্র বলা যায় না—পিছনের দরজা দিয়ে ঢুকে সোজা আমাদের তিনজনকে সার্চ করে ফেলুদার পকেট থেকে ওর কোল্ট রিভলভারটা বার করে মগনলালের কাছে দিয়ে দিল।

রিভলভারধারী জগদীশ ভদ্রলোকটিকে দিনের আলোতে দেখেও বাটরার সঙ্গে যে তফাতটুকু পেয়েছিলাম, তার চেয়ে বেশি পাওয়া যাচ্ছে না।

ডানদিক থেকে আবার সেই ধুপ ধুপ শব্দটা শোনা গেল। এবার মগনলাল সেদিকে একটা বিরক্ত দৃষ্টি দিয়ে বললেন, ভেরি স্যারি মিঃ মিত্তর, আপনার আর একজন ফ্রেন্ডকেও এখানে নিয়ে এসেছি আমি। উনি আমাদের ওষুধ নিয়ে

ল্যাবরেটরিতে টেস্ট করে ঝামেলা করছিলেন। ন্যাচারেলি ওনাকে রোকে দিতে হল।

উনিও কি বাঘের পেটে যাবেন?

নো নো মিঃ মিত্তর, হেসে বললেন মগনলাল, ওনাকে দিয়ে আমার অন্য কাম হবে। একজন ডাকটর হাতে রাখলে সুবিধা হবে আমার, মিঃ মিত্তর। আমার নিজের হার্ট খুব ভাল নেই, সেটা আপনি বোধহয় জানেন না।

তা হলে চরণামৃততে কাজ দিল না?

মগনলাল এ কথার কোনও উত্তর দেবার আগেই গঙ্গা ও কেশরী নামে দুটো ষণ্ডা মার্কা লোক লম্বা লম্বা দড়ি নিয়ে ঘরে ঢুকে সোজা আমাদের দিকে এগিয়ে আসতেই পার পর এমন কতকগুলো ঘটনা ঘটে গেল যে সেগুলো লিখে বোঝানো খুবই কঠিন। তাও আমি চেষ্টা করছি—

প্রথমে বাইরে একটা গাড়ির শব্দতে জগদীশ ভদ্রলোক খচু শব্দে রিভলভারটার সেফটি ক্যাচুটা খুলে ফেলুদার দিকে টান করে বাড়াতেই কিছু বাঝার আগেই দেখলাম ফেলুদার ডান পা-টা একটা হাই কিক্ করে রিভলভারটাকে ভদ্রলোকের হাত থেকে ছিটকে বার করে দিল, কিন্তু তার আগে ট্রিগারের চাপ পড়ে যাওয়াতে তার থেকে সশব্দে একটা গুলি বেরিয়ে বন্ধ সিলিং ফ্যানের ব্রেডের কিনারে লেগে সেটাকে ঘোরাতে আরম্ভ করে দিল।

এরই মধ্যে কখন যে ঘরে এত লোক ঢুকে পড়েছে জানি না। এদের কাউকেই চিনি না, কিন্তু বুঝতে পারছি এরা সবাই পুলিশের লোক। আর তার মধ্যে কিছু নেপালের আর কিছু আমাদের পশ্চিমবাংলার; এদেরই একজন খপ করে ধরে ফেললেন জগদীশকে, যিনি পিছনের দরজা দিয়ে পালাতে গিয়েছিলেন।

মগনলাল সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে, তার চোখ দিয়ে আগুন ঠিকরে বেরোচ্ছে।

খবরদার! আমার গায়ে কেউই হাত দিবেন না! খবরদায়!

আপনার ব্যাপারে পরে আসছি। মগনলালজি, বলল ফেলুদা, আগে এনারটা ফয়সালা হয়ে যাক।

ফেলুদার দৃষ্টি ঘুরে গেছে পুলিশের হাতে বন্দি জগদীশের দিকে।

আপনার বাঁ হাতের তর্জনীটা এতক্ষণ রিভলভারের ট্রিগারে ছিল বলে দেখতে পাইনি, বলল ফেলুদা, এখন দেখছি তর্জনীতে বেগুনি কালির দাগ। আপনি কি এখনও সেই লিক-করা কলামটাই ব্যবহার করছেন, মিঃ বাটরা?

আপনি মুখ সামলে কথা বলবেন মিঃ মিত্তর, ষাঁড়ের মতো চেঁচিয়ে উঠলেন মগনলাল, জগদীশ ইজ মাই–

জগদীশ না, কাটরা–অনন্তলাল বাটরা–ইজ ইওর রাইট হ্যান্ড ম্যান। জগদীশ বলে কেউ নেই, নকল বাটরা নেই, লোক একজনই। একটু চাপ দিলেই উনি চোখের কনট্যাকট লেনাস দুটো খুলে ফেলবেন, তা হলেই কটা ভাবটা চলে যাবে। আর মিঃ বাটরা বোধহয় জানেন না যে তিনি আজ ভোরে চলে আসার পর তার বাড়িতে সার্চ হয়েছিল, এবং একটি চোরা কুঠরি থেকে বেশ কিছু জাল একশো টাকার নোট পাওয়া গেছে—যেগুলো আপনার ওই জাল ওষুধের কারখানাতেই ছাপানো হত।

নেপাল পুলিশের একজন অফিসার এক বাণ্ডিল একশো টাকার নোট বার করে ধরলেন আমাদের সামনে। বাটরার মুখ ব্লটিং পেপার। ফেলুদা বলল–

আপনি একটা কাঁচা কাজ করে ফেলেছিলেন। কলকাতায়, মিঃ বাটরা। আপনি যে জাল নোটটা দিয়েছিলেন সেই কুকরির দোকানে, সেটা আর ফেরত নেননি। কারণ একবার যখন বলেছেন সেটা আপনি দেননি, তখন আর সেটা ফেরত নেওয়া যায় না; ফলে সেটা দোকান থেকে পুলিশের হাতে চলে আসে। এখন দেখা যাচ্ছে সে নোটের নম্বর আর আজ আপনার বাড়িতে পাওয়া নোটের নম্বর এক।

বাটরার শেষ অবস্থা, কিন্তু মগনলাল এখনও তম্বি করে চলেছে!

আমি ফের বলছি মিস্টার মিত্তর, আমি-

আপনি বড় বেশি বকছেন, বাধা দিয়ে বলল ফেলুদা, আপনার বুকনিটা বন্ধ করা দরকার। তোপ্‌সে, তোরা দুজনে চেপে ধর তো লোকটাকে।

আমি তো এ সব পারিই, কিন্তু লালমোহনবাবুর মধ্যেও যে হঠাৎ এতটা এনার্জি এসে যাবে সেটা ভাবতে পারিনি। দুই রাজ্যের পুলিশ হল দর্শক, আর তার মধ্যে আমাদের এই নাটক।

দুজনের কম্বাইন্ড ঠেলা আর চাপে মগনলাল সোফার সঙ্গে সিঁধিয়ে গেলেন। ফেলুদা এর মধ্যে ওর পকেট থেকে দুটো জিনিস বার করেছে, তার একটা ভদ্রলোকের হাঁসফাঁসানির ফাঁকে তার মুখের ভেতর চাল গেল। এটা হল একটা শুগার কিউব। বুঝলাম এটা আজই সকালে ফ্রিক স্ট্রিন্টের হিপিদের কাছ থেকে জোগাড় করে এনেছে ফেলুদা। দ্বিতীয় জিনিসটা হল একটা স্কচ টেপ, যেটা থেকে চড়াৎ করে খানিকটা অংশ ছিঁড়ে ফেলুদা সেটা দিয়ে মগনলালের ঠোঁট দুটো সিল করে দিল।

সব শেষে একটা সিগারেট কেসের মতো দেখতে জিনিস বার করে নেপাল পুলিশ অফিসারের হাতে দিয়ে ফেলুদা বলল, এই মিনি-ক্যাসেট রেকর্ডারটা এই ঘরে ঢুকবার আগেই আমি পকেটে চালু করে দিয়েছিলাম। এতে আপনারা এই ভদ্রলোকের জাল ওষুধের কারবার সম্বন্ধে ওঁঠুর নিজেরই বলা অনেক তথ্য পাবেন।

১২

ফেলুদা বলল, আমার ধারণা তার আপিসের জনসংযোগের কাজের মধ্য দিয়েই মগনলালের সঙ্গে বাটরার পরিচয় হয়।

আমরা ফিরতি পথে কাঠমাণ্ডুর আশি কিলোমিটার আগে সাড়ে সাত হাজার ফুট হাইটে দামান ভিউ টাওয়ার লজের ছাতে বসে কফি আর স্যান্ডউইচ খাচ্ছি। আমরা তিনজন ছাড়া আছেন ডাঃ দিবাকর, নেপাল পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর শর্ম, আর কলকাতার হামিসাইড ডিপার্টমেন্টের ইন্সপেক্টর জোয়ারদার। ডাঃ দিবাকরকে হাত-পা-মুখ বাঁধা অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল বাংলোর বৈঠকখানার দুটো ঘর পরে দক্ষিণে একটা বেডরুমে। হাত-পা বাঁধা অবস্থাতেই পা দিয়ে মেঝেতে লাথি মেরে উনিই ধপধপ শব্দ করছিলেন। তিনি যে ফেলুদার ফরমাশে তাঁর দোকানের ওষুধ টেস্ট করছেন সে খবর তার চর মারফত পৌঁছায় মগনলালের কাছে। তার রাইট হ্যান্ড ম্যান বাটরা আজই ভোরে একটা কুগি দেখতে নিয়ে যাবার অছিলায় ডাঃ দিবাকরকে তার বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে, মগনলালকেও তুলে, এখানে চলে আসে। মগনলালের দলকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে কাঠমাণ্ডু। এল এস ডি খেয়ে তার কী প্রতিক্রিয়া হয় সেটা কালকের আগে জানা যাবে না। ঘড়িতে বলছে পাঁচটা পাঁচ। বেশ বুঝতে পারছি আমাদের চারিদিকে ঘিরে থাকা হিমালয়ের বিখ্যাত চুড়োগুলোতে একটু পরেই সোনার রং ধরতে শুরু করবে।

ফেলুদা বলে চলল-বাটরা চতুর লোক, শিক্ষিত আর ভদ্র বলে তার ভারতবর্ষেও যাতায়াত আছে, এই সব জেনে মগনলাল বাটরাকে তার চোরা কারবারের মধ্যে জড়ায়।

অনীকেন্দ্র সোম জাল ওষুধের পিছনে উঠে পড়ে লেগেছে শুনে মগনলাল বাটরাকে দিয়ে তাকে হাঁটাবার মতলব করে। মিঃ সোম কলকাতায় যাচ্ছে জেনে বাটরাকে তার সঙ্গে পাঠায়। হয় এয়ারপোর্টে না হয় প্লেনে, বাটরা সোমের সঙ্গে আলাপ করে, যদিও বাটরা আমার কাছে এটা অস্বীকার করে। সোমের নেটবুকে একটা কথা লেখা ছিল—এ বি-র বিষয় আরও জানা দরকার। আমি প্রথমে ভেবেছিলাম। এ বি হল অ্যান্টিবায়োটিকস, কিন্তু যখন জানলাম বাটরার প্রথম

নাম অনন্তলাল, তখন বুঝতে পারলাম সোম আসলে বাটরার বিষয়েই আরও জানিবার কথা লিখেছিল। হয়তো আলাপ করে বাটরা সম্বন্ধে সোমের মনে কোনওরকম সন্দেহ দেখা দিয়েছিল।

আমার বিশ্বাস কথাচ্ছলে সোম বাটরাকে বলেছিল। সে কলকাতায় এসে আমার সঙ্গে দেখা করবে। বিষ্টরা আমাকে নামে জানত। তার তখন বিশ্বাস হয় যে সে যদি সোমকে খুন করে, তা হলে সে-খুনের তদন্ত আমিই করব।

নিউ মার্কেটে দৈবাৎ আমার সঙ্গে দেখা হয়ে যাবার ফলে একটা নকল বাটরা তৈরি করার আশ্চর্য ফন্দিটা বাটরার মাথায় আসে। মার্কেটে তার হাতে প্লাস্টিকের ব্যাগে নতুন কেনা একটা নীল রংয়ের শার্ট ছিল। আমার সঙ্গে আলাপ হবার পরমুহূর্তেই সে কোনও একটি কাপড়ের দোকানে ঢুকে তাদের ট্রায়াল রুমে গিয়ে পুরনোর জায়গায় নতুন শার্টটা পরে নিয়ে, পুরনোটা আরেকটা প্যাকেটে ভরে আমাদের সামনে দিয়ে হেঁটে চলে যায়, এবং বুঝিয়ে দেয় সে আমাদের আদৌ চেনে না।

পরদিন বিকেলে আমার বাড়িতে এসে সে নকল বাটরার ধারণাটা আমার মনে আরও বদ্ধমূল করার চেষ্টা করে। তার পরদিন সকলে নটায় তার কাঠমাণ্ডুর ফ্লাইট। মালপত্র নিয়ে ট্যাক্সি করে ভোরে হোটেল থেকে বেরোয়, পাঁচটায় সেন্ট্রাল হোটেলে গিয়ে সোমকে খুন করে চলে যায় এয়ারপোর্টে। ছুরিটা সে রেখেই যায়, যেন আমি মনে করি যে গ্র্যান্ড হোটেল থেকে যে লোক ছুরিটা কিনেছিল অথাৎ নকল বাটরা, সে-ই খুনটা করেছে।

কিন্তু আপনার প্রথম সন্দেহটা হয় কখন? প্রশ্ন করলেন ইন্সপেক্টর জোয়ারদার।

নোটবুকে আমার ঠিকানাটা লিখে দিই। সে আমাকে দিয়ে লেখাল, কারণ নিজে লিখলে লিখতে হত বাঁ হাতে। সে প্রমাণ করতে চেয়েছিল যে নকল বাটরাই লেফট-হ্যান্ডেড। কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে কী, যারা ন্যাটা হয়, তারা এক কলম দিয়ে

বেশি দিন লিখলে সেই কলমের নিব একটা বিশেষ অ্যাঙ্গেলে ক্ষয়ে যায়, ফলে রাইট-হ্যান্ডেড লোকেদের সে কলম দিয়ে লিখতে একটু অসুবিধে হয়। এই সামান্য অসুবিধাটা তখন বোধ করেছিলাম। কিন্তু গা করিনি। পরে যখন জানলাম যিনি খুন করেছেন তিনি লেফট-হ্যান্ডেড, তখনই প্রথম খটকাটা লাগে, আর তখনই স্থির করি যে কাঠমাণ্ডু গিয়ে ব্যাপারটা একটু তলিয়ে দেখতে হবে। অবিশ্যি এসে যে দেখব খুন একটা নয়, দুটো-সেটা ভাবতেই পারিনি।

ডাবল? ভুরু তুলে প্রশ্ন করলেন লালমোহনবাবু। আমরা সকলেই অবাক, সকলেই জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে দেখছি ফেলুদার দিকে। দ্বিতীয় কোন খুনের কথা বলছে ফেলুদা?

শেষ পর্যন্ত মুখ খুললেন ডাঃ দিবাকর।

উনি ঠিকই বলেছেন। টেট্যানাসের ওষুধ আমার টেস্ট করা হয়ে গিয়েছিল। খবরটা মিঃ মিত্রকে দেবার আর সুযোগ হয়নি। ওটা সত্যিই ছিল জাল। কাজেই এই ইনজেকশনের পর টেট্যানাস হয়ে মর‍্যাটা এক রকম খুন বইকী! যারা জাল ওষুধ চালু করে তারা তো এক রকম খুনিই।

আমি কিন্তু জাল ওষুধের কথা বলছি না।

এবার দিবাকরও অবাক হয়ে চাইলেন ফেলুদার দিকে। পাহাড়ের চূড়োগুলোতে সোনালি ব্লং লেগেছে বলেই বোধহয় সকলের মুখ এত হলদে দেখাচ্ছে।

তা হলে কীসের কথা বলছেন? ভাঃ দিবাকর প্রশ্ন করলেন।

সেটা বলার আগে আমি একটা কথা বলতে চাই। হিমাদ্রি চক্রবর্তী বছর তিনেক আগে একটা চোরা-কারবারের ব্যাপার ফাঁস করে দিয়েছিল। এই নতুন চোরা-কারবারটা সম্বন্ধেও তার মনে সন্দেহ জেগে থাকতে পারে সে খবর হরিনাথবাবু আমাদের দিয়েছেন। সুতরাং মগনলালের দিক থেকে তাকে হাঁটাবার একটা বড় কারণ পাওয়া যাচ্ছে। মগনলাল সে ব্যাপারে পেছ-পা হবার পাত্র নয়।

কিন্তু হটাবে সে কীভাবে?

রাস্তা আছে, বলল ফেলুদা, যদি একজন ডাক্তার তার হাতে থাকে।

ডাক্তার?

ডাক্তার।

কোন ডাক্তারের কথা বলছেন। আপনি?

এমন ডাক্তার যার অবস্থার উন্নতি দেখা গেছে সম্প্রতি-নতুন গাড়ি, নতুন বাড়ি, সোনার ঘড়ি, সোনার কলম–

আপনি এসব কী ননসেন্স-

–যে ডাক্তার সামান্য একটা স্ক্র্যাচ দেখে টেট্যানাসের কোনও সম্ভাবনা নেই বুঝেও ইনজেকশন দেয়। আজ আপনাকে হাত-পা বেঁধে ফেলে রাখাটা যে স্রেফ ভাওতা সেটা কি আমি বুঝিনি, ডাঃ দিবাকর? আপনিও যে বাটরার মতোই মগনলালের একজন রাইট হ্যান্ড ম্যান, সেটা কি আমি জানি না?

কিন্তু জল দিয়ে কি খুন করা যায়? কাঁপতে কাঁপতে তারস্বরে প্রশ্ন করলেন ডাঃ দিবাকর।

না, জল দিয়ে যায় না, যায় বিষ দিয়ে। কপালের শিরা ফুলে উঠেছে ফেলুদার—বিষ, ডঃ দিবাকর, বিষ! স্ট্রিকনিন! যার প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে টেট্যানাসের প্রতিক্রিয়ার কোনও পার্থক্য ধরা যায় না। ঠিক কি না, মিঃ জোয়ারদার?

ইন্সপেক্টর জোয়ারদার গভীরভাবে মাথা নেড়ে সায় দিলেন।

ডাঃ দিবাকর চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন, এবার আবার ধাপ করে বসে চেয়ার থেকে গড়িয়ে মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে গেলেন।

আসলে গল্প এখানেই শেষ, তবু লেজুড় হিসেবে তিনটে খবর দেওয়া যেতে পারে।

এক–এল এস ডি খেয়ে মগনলালের প্রতিক্রিয়া নাকি মোটেই ভাল হয়নি, একটানা তিন ঘণ্টা ধরে হাজাতের দেয়াল নখ দিয়ে আঁচড়ানোর পর ঘরের টেবিল ক্লথটাকে কাশীর কচৌরি গলির রাবড়ি মনে করে চিবিয়ে ফালা ফালা করে দেয়।

দুই–ওষুধের চোরা কারবার, আর সেই সঙ্গে জাল নোটের কারবার–ধরে দেবার জন্য নেপাল সরকার ফেলুদাকে পুরস্কার দেয়, যাতে কাঠমাণ্ডুর পুরো খরচটা উঠে আসার পরেও হাতে বেশ কিছুটা থাকে।

তিন–লালমোহনবাবুর ভীষণ ইচ্ছে ছিল যে আমাদের কাঠমাণ্ডুর অ্যাডভেঞ্চার উপন্যাসের নাম হোক ওম্ মণি পদ্মে হুমিসাইড। যখন বললাম সেটা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে, ভদ্রলোক শুধু হুম্‌ম্ বলে যেন একটু রাগত ভাবেই আমাদের ঘরের সোফায় বসে জপযন্ত্র ঘোরাতে লাগলেন।